রাজসী

দেবেশ দাশ

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রক—নিরঞ্জন চক্রবর্তী
প্রিন্টক্রাফ্‌ট লিমিটেড
৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা—১৩
প্রচ্ছদপট শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

মনোজ বসু

সুহৃদ্বরেষু,

বাংলা সাহিত্যের সেবায়

রাজসী

হয়েছে যার লেখনী

পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন সাহিত্যিক তাঁর লেখার জন্য এরকম ভাবে সম্মানিত হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

লেখকের রাজস্থান সম্বন্ধে এর পূর্ববর্তী রচনা "রাজোয়ারা" হিন্দি অনুবাদ পড়ে মেবারের মহারাণা বাংলা ও রাজস্থানের মধ্যে যে গভীর প্রীতি আছে তাতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য রাণা প্রতাপের সময় শিশোদীয়া রাজবংশের যুদ্ধে ব্যবহার করা প্রাচীন ঢাল ও তলোয়ার প্রকাশ্য দরবারে লেখককে উপহার দিয়েছেন। আশীর্বাদ করেছেন যে এই মহৎ কাজে আপনার মসী অসির চেয়ে বেশী শক্তিশালী হোক।

এই লেখকের অন্যান্য বই:

ইয়োরোপা (৪র্থ সংস্করণ)

প্রেমরাগ (২য় সংস্করণ)

অর্ধেক মানবী তুমি (২য় সংস্করণ)

রাজোয়ারা (৩য় সংস্করণ

রোম থেকে রমনা

হিন্দীতে

য়ুরোপা

রজবাড়া

অর্ধাঙ্গিনী

ইংরেজীতে

ইউরোপা

॥ ১ ॥
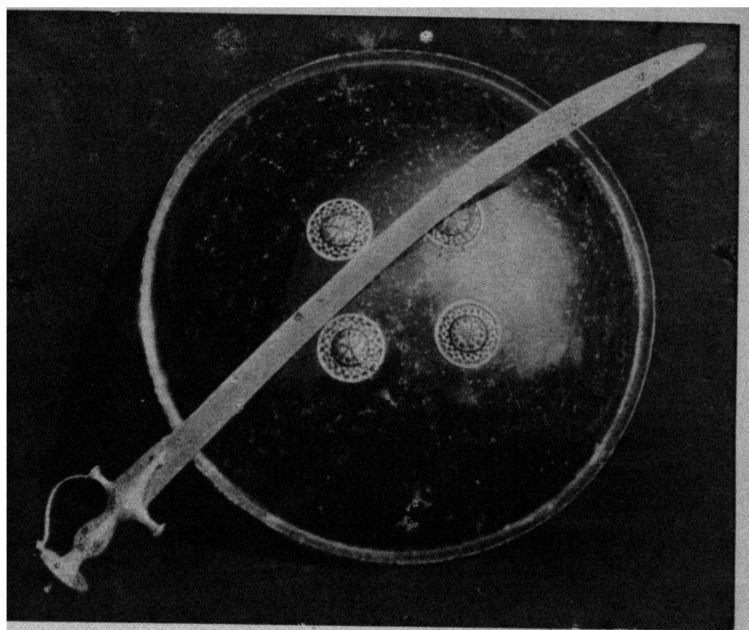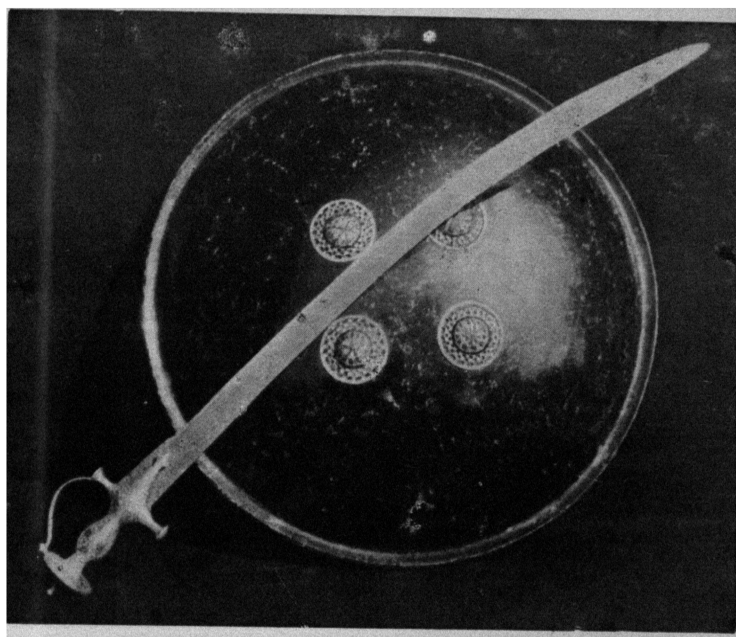
"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।"

মনে মনে সারা দুপুর গুনগুনিয়ে উঠেছে গানের কথাগুলি। আমার সোনার বাংলা। সোনার বাংলা! তোমায় যে কত ভালবাসি তা বুঝি এই বোদে-পোড়া মরুভূমির দেশে আসার আগে কখনো এমন করে বুঝতে পারিনি।

সিরোহি থেকে মাড়োয়ারের দিকে চলেছি। যত দূর দেখা যায় খালি ধু-ধু করছে সমুদ্র। নোনা জলের নয়, নুনের মত গুঁড়ো বালির সমুদ্র। ট্রেনের কাচের শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। এক-একটা দমকা হাওয়া আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মণ খানেক বালি যেন নতুন প্রাণ পেয়ে আহ্লাদে লুটোপুটি খেয়ে বেড়াচ্ছে। একটা আঁধি ধেয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে যে, আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যটা বোতল থেকে ছাড়া পেয়ে তেড়ে আসছে। আকাশ জুড়ে তার আনাগোনা, দীর্ঘশ্বাস, তার আকুলি-বিকুলি।

দিন-দুপুরে এই আঁধি আঁধার করে তুলেছে চার দিক। তার মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন ফোঁস ফোঁস করে গর্জে এগিয়ে যাচ্ছে। কামরার মধ্যে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী কোন রকমে মরুভূমির গরম মাথায় করে চলেছি। এঁটে বন্ধ-করা দরজা জানলার মধ্যে দিয়ে খোলাখুলি ঢুকতে পারছে না বলেই বোধ হয় আঁধির দৈত্য বার বার শাপমন্যি দিয়ে আগুনের হল্কা ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

নাঃ। এর চেয়ে কালবৈশাখী অনেক ভাল। আসে মাতালের মত হাওয়া, পাগলাঝোরার মত হুড়মুড় করে। কালো মেঘ নামে মেঘনাতে। খুশীতে ডগমগ হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে যায় আকাশ। গাছ-পালার ভিতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে জলদ রাগিণী বেজে ওঠে। ডাল-পালা শুরু করে তালে তালে নাচন। বাদল হাওয়ায় যদি কোন দৈত্য থাকে সে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায় না, দিয়ে যায় মুঠি মুঠি ছেঁড়া পাতাঝরা ফুলের উপহার। তারপর নামে বরষা। দেহের জ্বালা আর মনের অস্বস্তি ধুয়ে-মুছে দেয়। সদ্য-ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধটুকুও কত ভাল লাগে। তামাম ফরাসী মুলুকের সেণ্টের মধ্যে নেই তার তুলনা।

বাংলার কালবৈশাখীর সঙ্গে কি হয় মরুভূমির আঁধির তুলনা?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল যে, মাড়োয়ারের রাজা মালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় হেরে যেতে যেতে কোন রকমে কারসাজি করে সামলিয়ে নিয়ে শের শাহ বলেছিলেন—এক মুঠো ভুট্টার জন্য আমি হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলুম।

কিন্তু সেই এক মুঠো ভুট্টার দেশের লোকরাই আমাদের সোনার বাংলায় এসে মুঠো মুঠো সোনার সন্ধান পেয়েছেন।

সে সন্ধান আমরা দু' পাতা কেতাব পড়া মাথার অভিমানে এই দু'শো বছরেও পেলাম না। মা সরস্বতীর রাজহাঁসটির ঠোঁটের ঠোক্করে চোখ দু'টি প্রায় যায় যায় বলেই কি দৃষ্টিকাণা হয়ে গেলাম?

তবু—তবু যতই অকেজো হই না কেন, অযোগ্যেরও ভালবাসবার অধিকার আছে। এই অধিকারের সাফাই মনে মনে গাইছিলাম। তার চোটেই বোধ হয় গুনগুনানিটা একটু বেশী জোরে হয়ে গেল হঠাৎ—

আমার সোনার বাংলা...।

সামনে বসা সঙ্গীর মুখে একটু হাসি খেলে গেল। পরিষ্কার বাংলায় বললেন—নমস্কার, আপনি নিশ্চয়ই বাংলা মুলুক থেকে আসছেন?

বলা বাহুল্য, উনি আসছেন মাড়োয়ার মুলুক থেকে। যেখান থেকে বছর বছর নতুন নতুন লোক ভাগ্যের সন্ধানে বাংলা দেশে যান। যে ধন আমাদের চার পাশেই ছড়ান পড়ে আছে অথচ আমরা খুঁজে পাই না, সেই ধন ও'রা একেবারে যাকে বলে পথ থেকে কুড়িয়ে তুলে নেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনায় একটা নতুন কথা তিনি ভাল করে পেড়ে বসলেন। যদি রাজপুতানার ব্যবসায়ীরা বাংলা দেশ ছেঁকে না বসতেন তাহলে আরো অনেক বেশী টাকা বিদেশী বণিকদের হাত দিয়ে বিদেশে চলে যেত। ক্লাইব স্ট্রীটের শোষণকে রুখে দেশের টাকা দেশেই—হোক না কেন অবাঙ্গালীর পকেটে—রাখতে সাহায্য করেছে একমাত্র বড়বাজার, বাঙ্গালীর কলেজ স্ট্রীট নয়।

ভদ্রলোক শুনতে চাইলেন বাংলার অতীত দিনের সম্পদের কথা—যে সময় তাঁর দেশের লোকরা ভাগ্যের খোঁজে লোটা ও কম্বল মাত্র সম্বল করে দেশের পশ্চিম কোণা থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত দলে দলে চলে আসা শুরু করেনি।

ভদ্রলোকের কথাটা খুব মনে ধরল। জাঁকিয়ে বসলাম তাঁকে বাংলা দেশের রূপকথা শোনাতে। বার বার এসেছি এ'র দেশে রাজস্থানী রূপকথার সন্ধানে।

তন্ন তন্ন করে দেশটা দেখেছি প্রত্যেক বারেই। মনের জানালাটা খোলা রেখেছি সব সময়ই। যাতে গ্রীষ্মে বাদলে শীতে সর্বদাই সব কিছু দেখতে পাই। রাজপুতদেরই অতিথি হচ্ছি বার বার। বেড়াচ্ছি থাকছি, এমন কি স্বপ্নও বোধ হয় দেখছি তাদের সঙ্গে। এমন সময় যদি কেউ বলে,—এবার একটু বলুন আপনার নিজের দেশের কথা, তাহলে মনটা খুশীতে নেচে ওঠে বৈ কি!

না, আমি বাঙ্গালীর লেখা বই থেকে সে সোনার বাংলার পরিচয় দেব না। এমন কি, কোন ভারতীয়ের লেখা থেকেও নয়। নিছক বিদেশী যাঁরা, যাঁদের বাংলা দেশকে ভালবাসার কোন কারণ বা দরকার ছিল না, তাঁদের কথা নিয়েই এদেশের পরিচয় দেব।

বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনবার জন্য মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মাথাটা একটু হেলিয়ে বসলেন। তাঁর দু' কানে দুটো বড় বড় হীরে সোনার বাংলার ধনের পরিচয় দিয়ে ঝকমকিয়ে উঠল।

ইউরোপ তখন হিন্দুস্থানের লেখাজোখা নেই এমন সোনার স্বপ্ন দেখছে। আগে ইউরোপ মিশরকেই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর আর রত্ন-প্রসবিনী দেশ বলে মনে করত। কিন্তু দু'-দুবার বাংলা দেশকে তন্ন তন্ন করে দেখে বার্নিয়ের স্বীকার করলেন যে, মিশরকে যে সম্মান দেওয়া হয় সেটা আসলে বাংলারই প্রাপ্য।

সত্যি কথা বলতে কি, ফ্রান্স থেকে বার্নিয়েরকে যে ক'টি বিশেষ প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটিতে বাংলা দেশ কত সুন্দর, উর্বর ও ধনী, তার হিসাব চাওয়া হয়েছিল।

তখন বাংলা মোগল-সাম্রাজ্যের পনেরোটা সুবার মাত্র একটা সুবা ছিল। তবুও তার ধন ও সৌন্দর্যের খ্যাতি লোকের মুখে মুখে যে ফ্রান্স পর্যন্ত পেঁৗছিয়েছিল, সেটা নেহাত সামান্য কথা নয়।

আজ বাংলা দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষের, চালের র‍্যাশন আর আগুনের মত দামের দিনে কি করে বিশ্বাস করব যে, এই দেশেই এত চাল হত যে, শুধু কাছাকাছির প্রদেশগুলিকেই যে খাওয়াত তা নয়, তা নদীপথে বিহার আর সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতের শেষ কোণা, এমন কি সিংহল আর ভারত মহাসাগরের মালদ্বীপে পর্যন্ত রীতিমত চালান যেত? আমাদের পূর্বপুরুষেরা জাভা বা উত্তর-প্রদেশের চিনির মুখ চেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভোরে বসে থাকত না।

তারা নিজেরাই চিনি পাঠাত শুধু দাক্ষিণাত্যে বা বোম্বাই অঞ্চলে নয়, সেই সুদূর আরব, পারস্য পর্যন্ত।

আর মিঠাই? তার কথা বলতে এই মিঠাইয়ের রাজা কলকাতার বুকের ছাতি এখনো ফুলে উঠবে। দক্ষিণ আর পূর্ব-বাংলার মিঠাই নিয়ে পোর্টুগীজরা দেশ বিদেশে ভারী হাতে রপ্তানী কারবার করত। মধু ছিল একটা বড় চালানী মাল।

এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের কপালে যথেষ্ট ভাত জোটে না বলে সরকারী র‍্যাশনে তার বদলে কিছু কিছু আটার বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাতে আমাদের আপত্তি আর সে আটা খেয়ে পেটের বিপত্তির সীমা নেই। পেট-রোগা বাঙ্গালীর কাঁকরমণি চালই সই, তবু আটা চলবে না। অথচ সে যুগে আমরা শুধু যে প্রচুর গম জন্মাতাম তা নয়, এত চমৎকার আর সস্তা বিস্কুট তৈরী করতাম যে, ইংরেজ, পোর্টুগীজ, ডাচ সব বিদেশী জাহাজেই সে বিস্কুট ভারে ভারে চালান যেত।

আর এবার তৈরী হোন মোগলাই আর খৃষ্টানী খানার জন্য। সেকালের বাবুর্চি জানত যে ফিরিঙ্গি মনিবের জন্য টাকায় মাত্র গোটা কুড়ি পঁচিশ মুর্গী কিনে আনলেই তিনি কেল্লা ফতে বলে খুশীতে নেচে উঠবেন। হাঁস পায়রা ভেড়াও ছিল তেমনি সস্তা। হরেক রকম মাংস নুনে জারক করে নিয়ে বিদেশী জাহাজে চালান দেওয়া হত। তাজা বা নুনে জারান মদেরও চালান হত প্রচুর।

এত সুখ, খেয়ে বেঁচে থাকার সুখ দলে দলে বিদেশী আর মিশেলী জাতের লোকদের বাংলা দেশে টেনে আনত। যার অন্য কোথাও ঠাঁই জুটত না সে-ও এদেশে এসে আশ্রয় পেত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'কে কাঁদে ক্ষুধায়, জননী সুধায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া।'

সব বিদেশী ভ্রমণকারীই লিখেছেন যে, আর কোন দেশে বিদেশের সংগে বাণিজ্য করবার জন্য এত হরেক রকমের জিনিস তৈরী হত না। তুলো আর রেশমের জিনিসের জন্য বাংলা শুধু মোগল সাম্রাজ্য বা হিন্দুস্থানের নয়, এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশ এমন কি ইয়োরোপের ভান্ডার ছিল। মোটা ও মিহি, সাদা ও রঙীন সুতি কাপড় এত তৈরী হত যে, তার তুলনা নেই। সে যুগে দুর্গম জাপানে পর্যন্ত তা চালান যেত। রেশমী কাপড়-চোপড়েরও সমান সুদিন ছিল

বাংলা দেশে। কত প্রচুর রেশমী জিনিস যে নানা দেশে চালান যেত তার কোন হিসাব ছিল না। আর যেমন সুন্দর জিনিস তেমনি দামে সস্তা।

সোরা আর অন্যান্য খনিজ জিনিসও খুব ভারী হাতে বিদেশে চালান হয়ে বাংলাকে সোনায় মুড়ে দিত। মোম, গালা, মরিচ এ সবের ত' কথাই নেই।

এমন কি আজ যেখানে আলিগড় থেকে মাখন আর বিহার থেকে ঘি না এলে বাঙগালীকে ঘি মাখন ছাড়াই জীবন কাটাতে হবে, সেখানে সেই সোনার বাংলায় এত প্রচুর ঘি হত যে সমুদ্র দিয়ে তা চালান করা হত জাহাজ জাহাজ।

ইটালিয়ান ভ্রমণকারী মানুচ্চিও সেই সময়ে ভারতবর্ষে এসে সারা দেশ দেখে বেড়িয়েছিলেন। তিনিও লিখে গেছেন যে, ঢাকার চার দিকে পূর্ব বাংলায় অসম্ভব রকম আর প্রচুর পরিমাণে সুন্দর সুতি আর রেশমী কাপড় তৈরী হয় আর ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে জাহাজে জাহাজে সে সব চালান যায়। পশ্চিম-বাংলায় রাজমহল অঞ্চলেও খুব মিহি কাপড় আর প্রচুর চাল হয়।

দু'শো বছরেরও আগে কলকাতায় বসে "মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক টুকরো" বই লিখেছিলেন রবার্ট অর্ম। বাংলা দেশে তখন সুতি কাপড় তৈরী ছিল একটা জাতীয় শিল্পকলা। প্রায় প্রত্যেকটি ছেলে, বুড়ো, মেয়ে তাঁত চালাচ্ছে না এমন গ্রাম তখন বাংলা দেশে খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। বিলাসীদের চূড়ামণি মোগল সম্রাট আর তার বেগম-পরিবারদের জন্য ব্যবহারের সমস্ত কাপড় তৈরী হত ঢাকাতে। এত মিহি বুনন ছিল তাদের যে, ইয়োরোপীয় বা অন্য যে কোন লোকের জন্য যা কাপড় তৈরী হত, তার দশ গুণের চেয়ে বেশী দাম হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ধারাই চলে এসেছিল।

জগতের আলো নুরজাহান ঢাকাই মসলিনের এত ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর সময় থেকে মোগল বাদশার হারেম আর আমীরদের ঘরে এই কাপড়েরই জোর রেওয়াজ হয়ে গেল। সে যুগের টাকার হিসাবে এক টুকরো দশ হাত লম্বা আর দু হাত প্রস্থ আর ওজনে মাত্র নশো গ্রেণ বা পাঁচ সিক্কা আব-ই-রাওয়ান অর্থাৎ জলের ধাবা প্যাটার্ণের মসলিনের দাম হত চারশো টাকা। এ যুগের হিসাবে ধান-চালের দামের নিরিখে অন্ততঃ তিন হাজার টাকা।

সম্রাট আওরঙগজেব এক টুকরো জামদানী মসলিন অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। দাম দিয়েছিলেন তখনকার সময়ে আড়াই শো টাকা।

শেঠজী ততক্ষণে তার মিহি ধুতিখানার খুঁটে আঙগুল বুলোচ্ছেন। দেখে আমার সন্দেহ হল যে, হয়ত তিনি বাংলা দেশের শুধু মিহি আর মোলায়েম

সম্পদের ইতিহাস শুনতে শুনতে একটু হয়রান হয়ে পড়ছেন। তাই এবার অন্য রকমের কথা পাড়লাম।

মনে করবেন না যে, বাংলা শুধু ভাত-কাপড়েরই বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকত। এই দেশ থেকে যে এত সোরা চালান যেত তা কিসের জন্য জানেন? বারুদ তৈরী হবার জন্য। আমরা যদি সোরা না পাঠাতাম, তাহলে যুদ্ধবিদ্যায় কোন আধুনিকতা, কোন নতুন আবিষ্কারই সহজ হত না। ইয়োরোপীয়রা ত' এদেশে পাট গেড়ে বসল এই বারুদেরই কল্যাণে।

আর যুদ্ধ-জাহাজ? সে-ও এখানেই তৈরী হত। যুদ্ধের জাহাজ আর বাণিজ্যের জাহাজ এখান থেকে হিন্দুস্থানের সর্বত্র, মায় পারস্য, আরব, চীন, দক্ষিণ সাগরে ঘুরে বেড়াত। ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন টমাস বাউরী এদেশে দশ বছর কাটিয়ে তার "বঙ্গোপসাগরের চার দিকের দেশগুলির ভূগোল" কাহিনীতে সেকথা লিখে গেছেন।

বাঙ্গালীর নৌ-যুদ্ধে বিক্রমের কথা শুধু কাহিনী নয়, ইতিহাসও বটে। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে লিখে গেছেন, কেমন করে বাঙ্গালীর নৌ-বল জৌনপুর পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে লড়ে গিয়েছিল।

শেঠজীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। য়্যা, মশায়, আপনারাও লড়াই করতেন না কি?

হেসে তার ভুল ভাঙিয়ে দিলাম—বাংলার ইতিহাস আমাদের দেশে ঠিক মত পড়ান হয় না। না হলে সবাই জানতে পারত যে, বাঙালী কখনো বেশী দিন দিল্লীর কাছে মাথা নীচু করে থাকেনি। সর্বদাই মাথা উঁচু করে উঠেছে। সব চেয়ে নামকরা মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী তারিখি-ফিরোজশাহীতে এ জন্যেই লিখেছিলেন যে, চতুর আর ওয়াকিবহাল লোকেরা লক্ষ্মণাবতীর নাম দিয়েছে বুলঘাকপুর অর্থাৎ লড়াইয়ে শহর। স্বাধীনতার জন্য আবেগ বাংলা দেশের মাটিতেই গজায়। তাই দিল্লী থেকে যে সব সুবাদার পাঠান হত তারা সেখানে গিয়েই বাংলার স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে দাঁড়াত। অন্য উপায় ছিল না। কারণ তা না হলে অন্য লোকেরা তাদের হঠিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।

রাজোয়ারার চেয়ে বাংলা তাহলে কম কিসে? শুধু কর্ণেল টডের মত অতীতকে নতুন করে গড়ে দেখাবার লোক নেই বলে।

কিন্তু লড়াইয়ে আমরা ধর্মযুদ্ধের নীতি মানতাম। সিলভিয়েরা ছিল একজন পোর্টুগীজ জলযোদ্ধা। বাংলা দেশ থেকে গুজরাটে যে সব জাহাজ যাচ্ছিল, সেগুলি পথে আটক করে মাঝিমাল্লাদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বেগার খাটাতে চেয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পোর্টুগীজ জলদস্যুরা বিনা ঝঞ্ঝাটে এরকমভাবে ডাকাতি করে বন্দীদের খুশি মত খাটিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা প্রথম বাধা পেল এই বাঙ্গালীদের কাছে।

আর বাঙ্গালী সমাজ? তখনকার সভ্য বাঙ্গালী সমাজ আর বাংলার রাজদরবার পোর্টুগীজদের এজন্য খুব ছোট বলে মনে করত! পৃথিবীর এক কোণায়, হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যের এক টেরে থাকলেও বাংলায় 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ল' মেনে চলাই রীতি ছিল।

শুধু ধানে নয়, ধনেও ভরা ছিল সোনার বাংলা। আওরংগজেব যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধে ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন তখন বাদশার বিরাট অন্দরমহলের আর সেনাদলের খরচ চালানর একমাত্র উপায় ছিল বাংলা দেশের টাকা। আঠার শতকের প্রথম চল্লিশ বছর দিল্লীর মসনদ দাঁড়িয়েছিল শুধু বাংলার সোনার বনিয়াদের উপর।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল স্ট্রেনশ্যাম মাস্টার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে লিখেছিলেন যে, পনের বছর বাংলার সুবেদারী করে শায়েস্তা খান যা টাকা করেছিলেন, পৃথিবীতে আর কোথাও কেউ তেমন করতে পারবে না। তার মোট টাকা তখন ছিল সে যুগের আটত্রিশ কোটি টাকা, আর দৈনিক আয় ছিল—এমন কিছু নয়—মাত্র দু লাখ টাকা।

শেঠজীর মুখখানা হাঁ হয়ে যাচ্ছে দেখে বলে ফেললম—না, না, ভয়ের কিছু নেই। শায়েস্তা খানকে হিসেব লুকোতে হয়নি। ইনকাম ট্যাক্স ছিল না সে সোনার যুগে। অবশ্য সিধেটা ভেটটা পাঠাতে হত।

মাসির-উল-উমরা নামে মোগল ওমরাহদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বইয়েতেও এমনি অবিশ্বাস হবার মত ধনরত্নের কথা লেখা আছে।

আওরংগজেবের নাতি বাংলার সুবেদার আজিমকে লেখা বাদশাহী চিঠিতে আছে, কেমন করে বাংলার উদ্বৃত্ত নগদ টাকা আওরংগজেবের কাছে গাড়ি গাড়ি বোঝাই হয়ে চালান যেত। এত টাকার হুণ্ডি দেবে পৃথিবীতে কোন্ শেঠ বা

কোন্‌ ব্যাংক? তাই সেই রেল-স্টীমার-হীন যুগে চালান যেত কাঁচা টাকা গাড়ি গাড়ি বোঝাই।

তার পরে যখন মোগল মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি চলতে লাগল, প্রত্যেক নতুন বাদশাহেরই তখন একমাত্র ভরসা ছিল বাংলা দেশ। বাংলার সোনা যার হাতের মুঠোয় তারই কেল্লা মতে। ফরোখশায়ার এরই জোরে দিল্লীতে সম্রাট হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের ট্রেন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এক মনে চলেছে। ধূ-ধূ করছে শুধু বালি আর শুধু বালি। এমন কি, এদিকে ওদিকে কাঁটার ঝোপ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। শুধু সোনালী বালি। ভাবতে লাগলাম, যেমন করে বাংলার মাটিতে সোনা বিছান ছিল। কোথায় গেল অত জমান সোনা?

তার উত্তর পেলাম ক্লাইভের জবানবন্দীতে। পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটিতে। বাংলায় অসম্ভব লুঠের জন্য আসামী লর্ড ক্লাইভ নিজেকে বাঁচাবার জন্য সাফাই গাইলেন—"পলাশীর জয়ের ফলে আমি কি অবস্থায় পড়লাম তা বিবেচনা করে দেখুন। একজন বড় রাজা আমার মর্জির উপর নির্ভর করছে। আমার পায়ের তলায় একটি মহাধনী শহর। শুধু আমার সামনে খুলে দেওয়া হল মাটির নীচের তোষাখানা, তার দু'পাশে সোনা আর মণি-মাণিক্য স্তূপ করে রাখা হয়েছে—আমি চললাম তার মধ্যে দিয়ে হেটে। মিস্টার চেয়ারম্যান, এই মুহূর্তে আমি আমার নিজের সংযমের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।"

সত্যিই ত'? যে সময় টাকায় চার মণ চাল পাওয়া যেত, সে সময় ক্লাইভ হাতিয়েছিলেন মাত্র চল্লিশ লাখ টাকা।

পকেটের সুতির রুমালটা চোখ থেকে পকেটে ফিরে যাবার সময় মনে পড়ল ইংরেজ কুঠিয়ালদের রুমালের কারবারের কথা। ওরা একবার বালেশ্বরে বার হাজার রেশমী রুমাল মাত্র সাড়ে তিন টাকায় কিনে নিজেদের দেশে চালান দিয়েছিল।

কিন্তু কোথায় গেল বাংলার সেই রপ্তানি বাণিজ্য—যাতে ভারে ভারে বিদেশী টাকা আসত এদেশে? যার ফলে বার্টার অর্থাৎ জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে কেনা-বেচা করার নিয়ম বাংলা থেকে সে যুগে একেবারে উঠে গিয়েছিল।

কোথায় গেল টমাস বাউরীর হিসাবে লেখা চিনি, সুতির কাপড়, গালা, মধু, মোম, ঘি, তেল, ডাল, রেশম আর চালের জাহাজ-ভরা চালান?

বাংলায় ফলের দোকানে গিয়ে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় আজ-কাল। যেমন দাম, তেমনি কম মাল। আর গ্রাম দেশে ত' মরশুমের সময় ছাড়া কোন ফল চোখেই পড়ে না। এমন দামের গরম যে ফল জিনিসটা আজকাল শুধু কবিতা লিখে হা হুতাশ করবার মত জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি বাংলা দেশের আদি ও অকৃত্রিম ফল কলাকে পর্যন্ত কলা দেখিয়ে সিঙ্গাপুরী কলা বাজার মাত করে রেখেছে। অথচ বাংলার কলা সম্রাট বাবরের সময়েও সব চেয়ে মিঠে বলে নাম ছিল।

এখানে সাড়ে তিন শ' বছর আগেকার একটা ঘটনা বলি। জাহাঙ্গীর আর শাজাহানের সময়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম অঞ্চলে মোগলদের যুদ্ধের ইতিহাস বাহারিস্তান-ই-ঘাইরি বইতে সোনার বাংলা গ্রামাঞ্চলে মোগল সৈন্যদের তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ানর কথা আছে। এক দিন রাত্রে এক গ্রামে শাজাহান তার আমীরদের বিশেষ পেয়ার দেখাবার জন্যে কি উপহার দিলেন তা একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন আজ। না, কিছুতেই ঠাহর করতে পারবেন না। বাজী রেখে বলতে পারি।

সিঙ্গাপুরী আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের এঁচোড়ে-পাকা চালানী কাঁচা-পাকা কলা খেতে অভ্যস্ত জিভ নিয়ে ভেবে দেখুন বিলাসী ও শিল্প রসিকের সেরা সম্রাট শাজাহান তাঁর সভাসদদের অনুগ্রহ করলেন বাদশাহী খানার অংশ থেকে মর্তমান কলা দিয়ে। তার পর মনে পড়ল যে বিশেষ গোলমেলে ওমরাহ শিতাখানকে তার জন্য বেছে রাখা কলাগুলি দেওয়া হয়নি। সেগুলি মহলে যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছিল। ডাক, ডাক, খোঁজাদের কলাগুলি নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু অনেক ডাক-হাকের পর বেচারারা মাত্র দু'টি কলা এনে হাজির করল। ব্যাপার কি?

সুলতান আওরংগজেব অমন কাঁচা সোনার বরণ আর পাকা সৌরভে ভর মর্তমানের অমৃত লুকিয়ে চাখতে চাখতে আনমনে প্রায় সবগুলিই সাবড়ে দিয়েছেন। অপকর্মটা যে কতখানি হয়েছে তা খেয়ালে এল যখন মাত্র আর দুটো বাকী আছে।

রাম রাম! ইস্ লিয়ে আপলোগ বংগালমে মর্তমানকো সর্বাড় কেলা ভি কহতে হ্যায়।—ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মহা একটা আবিষ্কার করে ফেলার বাহাদুরী অনুভব করতে করতে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। উচ্ছ্বাসের চোটে মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলার বদলে একেবারে খাস রাষ্ট্রভাষাই বেরিয়ে এল।

সাবাস শেঠজি, আপনার যে রকম রসবোধ আছে, তাতে বাংলাদেশে বাস করা সার্থক হয়েছে।

সে কি কথা বললেন সার? আজকাল ত' অনেক বাঙ্গালী মনে কষ্ট পায় যে, অবাঙ্গালীরা এসে বাংলার ধন সব লুটে পুটে খাচ্ছে।

শেঠজির কথার মধ্যে কোন জ্বালা ছিল না, কিন্তু মুখে ছিল হাসি।

আমিও হাসি বজায় রেখেই বললাম—তা আর কি করা যায় বলুন? যে দেশে যত ধন রতন আছে সে দেশেই তত বিদেশীর আমদানী হবে—যদি সেখানকার লোকেরা নিজেদের কোট নিজেরা সামলাবার মত হিম্মৎ না রাখে। কই, আপনারা ত' সোনার বাংলার যুগে আমাদের ওখানে তেমন পাট্টা গাড়তে পারেননি? এই ধরুন না, এই সেদিনও পাকিস্তান হবার আগে ঢাকা শহরের কারবারে ত' আপনারা জুৎ করতে পারেননি?

প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে এই। সে কোন জায়গাই খালি রাখতে দেয় না। যেখানে একটুখানি ফাঁক আছে, সেটাকে ভরে ফেলবার জন্য বাইরে থেকে চাপ আসবেই। বিশেষ করে যদি ঘরের লোক অকেজো হয়।

আরো বিশেষ করে—যদি সে ঘরে এত কিছু পাওয়ার মত জিনিস থাকে।

বাংলা দেশ যে শুধু ধনধান্যে পুষ্পে ভরা ছিল তা নয়, এখানকার মেয়েরা ছিল এত সুন্দরী আর মিষ্টি স্বভাবের যে,—যদিও আজকাল ইয়োরোপীয়ান মেয়েদের দিকে গোটা পৃথিবী সতৃষ্ণ চোখে তাকায়—সে যুগে অর্থাৎ যখন সাদা রঙের মহিমা সাদা-রাজের কল্যাণে এমনভাবে ফুটে ওঠেনি, তখন ইয়োরোপীয়রাই এই শ্যামল দেশের শ্যামা মেয়েদের অপরূপ রূপসী মনে করত।

সে যুগে পোর্টুগীজ. ইংরেজ আর ওলন্দাজদের মধ্যে খুব চলতি একটি কথাই ছিল যে, বাংলা দেশে ঢুকবার একশ'টা পথ আছে, কিন্তু ফিরে যাবার পথ একটিও নেই।

এ কথা তারা বলত কারণ বাংলা দেশ খুবই সুখে সহজে ও আরামে থাকবার দেশ ছিল। কিন্তু এই মরুভূমির দেশে ঢুকে একবার পাঠান সম্রাট শের শাহও ভেবেছিলেন যে, মাড়োয়ার থেকে বেরিয়ে যাবার পথ একটও নেই। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

ইতিহাসের সেই সত্য কাহিনীটা এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে শোনাতে শোনাতে বাকী পথটুকু শেষ করে দিতে পারলে মন্দ হয় না।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি, এটা হয়ে দাঁড়াল মাড়োয়ারের রাজা মালদেবের

সমস্যা। মোগল-পাঠানের টলমলে টালবাহানার মাঝখানে পড়ে নতুন একটা পরিস্থিতি হাজির হল। এত দিন ধরে খুব বিচক্ষণ রাজনীতিকের মত তিনি আস্তে আস্তে মাড়োয়ারের বড় হবার পথ তৈরী করে আসছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, রাজপুতদের মধ্যে এত ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান বিশেষ দেখা যায় না।

পলিটিশিয়ান কথাটাই ব্যবহার করলাম। কারণ, এই কথাটার মধ্যে যতখানি ছল চাতুরী আর ক্ষুরের মত ধারালো বুদ্ধির ইঙ্গিত আছে, বাংলা প্রতিশব্দ রাজনীতিকের মধ্যে তার এক কণাও নেই। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি—তা খুলে বলতে হবে? এই ধরুন, চাণক্য হলেন রাজনীতিক, আর কৌটিল্য বলতে বুঝায় পলিটিশিয়ান।

এ হেন মালদেব চোখের সামনে চিতোরকে বাহাদুর শার হাতে ছারখার হয়ে যেতে দেখলেন। দেখলেন, কেমন করে হুমায়ুন সাপ মারলেন অথচ লাঠিটাও ভাঙতে দিলেন না। থুড়ি, সাপ তাড়ালেন অথচ লাঠিটা চালালেন না পর্যন্ত। মনের নোটবুকে সে শিক্ষাটা ভাল করে টুকে রাখলেন মালদেব।

রাজনীতিতে গুরুজীর দিনও ঘনিয়ে এল। এবার সাকরেদের পালা—বিদ্যার দৌড় কত দূর এগিয়েছে তার মহড়া দিতে হবে।

বাংলা বিহারে যখন হুমায়ুন আর শের শাহে লড়াই চলছে, তখন মালদেব নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। তিনি মেবারের পতনের পর মায়োয়ারকে সব চেয়ে বড় রাজপুত রাজ্যে দাঁড় করালেন। মাড়বারী চারণ কবির ভাষায় তিনি রাজ্যের চারদিকে আর নতুন জিতে নেওয়া দেশগুলিতে বেশ গুছিয়ে রাঠোর-বংশেব বীজ পুততে লাগলেন। রাজপুতদের মধ্যে বংশের টানই সব চেয়ে বড় টান। তাই শুধু রাঠোরদেব মধ্যে থেকেই কমসে কম পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তৈরী কবে রাখলেন।

কাল সন্ধ্যের দোস্ত যদি আজ ভোবে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে বাজনীতির খেলায় রাতারাতি সে দুষমণে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠিক যেমন করে চৌদ্দ বছর আগে বাবর রাণা সঙ্গের দুষমণ হযে গিযেছিলেন। এত দিন মালদেব মোগল-পাঠানের লড়াইযে মোকা পেয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু সে লড়াই বেশী দিন চলল না। হুমাযুন হেরে রাজপুতানায় পালিযে এলেন। কাজেই মালদেব তাকে আবার ঠেকা দিয়ে তুলে ধরে দিল্লীর তখ্‌তে বসাবার প্রস্তাব পাঠালেন।

কিন্তু একেবারে পাকাপাকিভাবে নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এনে ফেলা

ওস্তাদের খেল নয়। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিজে হেরে গেলে বেচারী হুমায়ুনের আর নতুন লোকসান কি হবে? কিন্তু নিজের যে সবই যাবে। কাজেই মালদেব শের শাহের সঙ্গেও সন্ধির কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

এদিকে হুমায়ুনেরও মনে সন্দেহের অন্ত নেই। মালদেব কেন নিজে এসে হাজির হলেন না হুমায়ুনকে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্য? কেন শুধু কিছু ফলমূল আর সোনার আশরফি দিয়েই সিধা পাঠান শেষ করলেন? কেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাস্তায় লাল শালু পাততে পাততে এগিয়ে এলেন না?

এদিকে শের শাহের দূতও মাড়োয়ারের রাজসভায় এসে হাজির হয়েছে। তবাকত-ই-আকবরিতে প্রমাণ আছে যে, হুমায়ুনকে বন্দী করে শের শাহের হাতে গছিয়ে দিলে মালদেবকে অনেক কিছু ভেট দেওয়া হবে, এমন আশাও পাঠান সম্রাট দিয়েছিলন। আর মালদেব নাকি তাতে অরাজীও ছিলেন না।

কিন্তু দেখা গেল যে, খাঁটি রাজপুত মালদেব হুমায়ুনকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শের শাহের হাতে ধরিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করলেন না।

এদিকে শের শাহ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন মাড়োযারের মধ্যে—হয় নিজেই হুমায়ুনকে আশ্রয় থেকে বের করে দাও, না হয় পাঠানদের সে কাজ করতে দাও। অর্থাৎ লড়ে যাও আমার সঙ্গে।

হুমায়ুনের দূত শেষ পর্যন্ত বিনা নোটিশে মালদেবেব রাজধানী ছেড়ে সটকে পড়ল। আর মালদেবও যেন মোগলদের পাকড়াবার জন্যই টেনে ঘোড়সোয়ার সৈন্য পাঠালেন। নেহাৎ কম নয়। একেবারে পনের শ'।

কিন্তু হুমায়ুনের মাত্র এক শো জন সৈন্য এদের মধ্যে যারা বেশী এগিয়ে এসেছিল, তাদের তাক করে তীর ছুড়ল। দু' দুজন রাজপুত সোয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল একেবারে সেই মরুভূমির বালির উপর। বাকী সবাই মনে হল যেন হার মেনে পালিয়েই গেল।

শের শাহ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ মাড়োয়ারের সঙ্গে লড়াই করার মত অবস্থা তখনো দিল্লীর ছিল না। নিজেরই তখ্‌ত যে টলমলে। আর মালদেবও খুশী হলেন যে, কূটনীতির চালে তিনি শের শাহকে কাত করে ফেরত পাঠাতে পারলেন।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি একেই বলে—পূব-বাংলায় পাটের কারবারী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খুশী মনে বলে উঠলেন।

না, না, অত খুশী হবার মত ব্যাপার শেষ পর্যন্ত হয়নি শেঠজী! শুনলে

কষ্ট পাবেন, কিন্তু আমরা চিরকালই রাজনীতিতে একেবারে নাবালক—প্রতিবাদ করে বললাম আমি।

মনে পড়ল যে, রাজপুত বীরদের মুখের শোভা গোঁফ-জোড়াকে বীরত্বের নিশানা বলে মনে করা হত। তাই আরো একটা কথা যোগ করে দিলাম—শুধু যে নাবালক তা নয়, জন্ম-মাকুন্দো। গোঁফ জোড়া কোন দিনই গজাবে না।

এ হেন টিপ্পনী শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেল শেঠজির। বোধ হয় ভাবলেন যে, যারা রাজনীতিতে এত কাঁচা তারা বিদেশের সংগে বাণিজ্যের নীতি তৈরী করতেও এত কাঁচা বুদ্ধি দেখাবে যে, তার পাটের রপ্তানীতে পাকা মুনাফা না-ও থাকতে পারে।

যাই হোক, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি? শের শাহ কেমন কবে চতুবালিতে মালদেবকে কাত করেছিলেন সোজাসুজি সে কাহিনীতে চলে এলাম।

ঝগড়ার কোন নতুন কারণ গজায়নি। কিন্তু দিল্লীর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূর পর্যন্ত রাঠোর মালদেবের রাজত্ব এসে পড়েছে, এটা কি করে সহা যায়? কাজেই বছর দেড়েকেব মধ্যেই সৈন্য সাজিয়ে মারি ত' গণ্ডার, লুঠি ত' ভাণ্ডার, এই মন্ত্র জপতে জপতে শের শাহ চললেন মাড়োয়ারে। এত বেশী সৈন্য আর জীবনে কখনো তিনি নিয়ে যাননি কোথাও। কিন্তু রাঠোর যে সব চেয়ে বড় প্রতাপশালী বীর! শুধু যে গণ্ডারের মত সইতে পারে তা নয়; বাঘের মত লড়েও যায়। আর হাতীর পিঠে চড়া শত্রুরও তোয়াক্কা করে না। রাঠোরের লড়াই, না হাতীব লড়াই।

কিন্তু মালদেব আফগান সৈন্যদের এমন বেকায়দা জায়গায় পাকড়াও করলেন যে, শের শাহ প্রমাদ গণলেন। যতই না কেন খান্দাক (আজ-কালকার যুদ্ধের ট্রেঞ্চ) ঘোরান, বস্তার দেওয়াল দাঁড় করান, আর কামান হাতী আর বন্দুক সাজান, রাঠোর ঘোড়সোয়ারদের এ'টে উঠবার ক্ষমতা রইল না একটুও। মালদেবের সৈন্য ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার আর শের শাহর আশী হাজার। কিন্তু ঐতিহাসিক বদাউনির ভাষায়—শের শাহ "মুর্খ, শুয়োরের মত স্বভাবের খচ্চর হিন্দুদের" বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদের এমন ঘোর বিপদে ফেলতে রাজী হলেন না।

অথচ কোন ফাঁকই নেই পালাবার। এ যে মহা বিপদ হল!

আচ্ছা. নিজের ছায়াকেই ভূত মনে করে যাতে মালদেব পালান, সে রকম

কৌশল একটা আঁটা যাক। 'বলং বলং' ত' 'বাহুবলম্' নয়! 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'—এ যে শাস্ত্রের বচন।

লিখলেন অনেকগুলি জাল চিঠি। যেন মালদেবের সর্দাররাই লিখছেন শের শাহের কাছে। পাঠালেন সেগুলি মালদেবের উকীলের তাঁবুর সামনে। উকীল সেগুলি মাটিতে পড়ে আছে দেখে রাজার কাছে পেশ করলেন। শের শাহের মতলব হাসিল হল।

মহা সর্বনাশের কথা! এতগুলি সর্দার যদি লড়াইয়ের সময় বিশ্বাস-ঘাতকতা করে আফগানদের দলে এসে ভিড়ে যায়, তাহলে মালদেব যাবেন কোথায়? পালা পালা, তাঁবু তুলে প্রাণ নিয়ে পালা!

সর্দাররা এসে এই মিথ্যা সন্দেহ ভাংগতে চাইলেন। শপথ করলেন নিজেদের সম্মানের নামে, ভগবানের নামে। কিন্তু হায়? ভাংগা কাচ আর ভাংগা মন জোড়া লাগে না। মালদেব রাতারাতি যোধপুরে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু পালালেন না জয় চন্দেলা আর কুম্ভ নামে দুজন সর্দার। তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়েই নাম রক্ষা করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। মাত্র বার হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁরা শের শাহের আশী হাজার সৈন্যের উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘোড়া চড়ে শত্রু মারতে খুব জুৎ হচ্ছে না দেখে তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে বর্শা আর তলোয়াল নিয়ে ছুটে চললেন। শের শাহ হুকুম দিলেন, যেন পাঠানরা রাঠোরদের সংগে সম্মুখ সমরে এগিয়ে না যায়। সেটা আত্মহত্যার সামিল। তাই তাঁর সৈন্যরা সামনা-সামনি তরোয়াল নিয়ে ওদের সংগে লড়াই করলে তাদেরই গর্দান যাবে এই হুকুম দিলেন।

সামনে এনে দাঁড় করান হল হাতী-চড়া পল্টন, কামান-চালান গোলন্দাজ আর পিছনে রইল সারি সারি খোরাসানী তীরন্দাজ। বার হাজারের একটি রাঠোরও প্রাণ নিয়ে ফিরে গেল না। সেখানে রাশি রাশি শত্রুর মৃতদেহের মাঝখানে তাদের দেহ পড়ে রইল। অসংখ্য ঝরাপাতার মাঝখানে যেমন করে পড়ে থাকে ঝরা ফুলের রাশি।

আহাম্মক! নেহাতই আহাম্মক! দুশো বছর পরে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবও রাজপুতদের আহাম্মক বলেই নিন্দা করেছিলেন। তিনি তুরাণী সিপাহীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, ওরা অন্য কোন জাতের চেয়ে বেশী ওস্তাদ লড়াইয়ে। ছল-চাতুরীতে, দুষমণের উপর তেড়ে হামলা করতে ওরা ওস্তাদ। তবে দরকার মত লড়াইয়ের মাঝখানে হঠাৎ সটকিয়ে পড়তেও ওদের

কোন দ্বিধা বা লজ্জা হব না। জন দেওয়া-নেওয়ার কারবারে সমান বাহাদুর হলেও এই হিসেবে ওরা হিন্দুস্থানীদের পাঁড় আহাম্মকীর চেয়ে একশ ধাপ দূরে। হিন্দুস্থানীরা মাথা দিয়ে দেবে, কিন্তু নিজেদের কোট ছেড়ে দেবে না। এমনি আহাম্মক।

কিন্তু শের শাহ এই লড়াইয়েব শেষে মৃতদেহের জঙ্গল আর তার উপরে ধূ ধূ করা মরুভূমির বালি দেখে মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলেন যে—এক মুঠো বাজরার জন্য আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহী হারাতে বসেছিলাম।

সেই এক মুঠো বাজরার দেশেব দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। আবার সেই সুতির রুমালটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল। রেশমী রুমাল নয়—যে রুমাল তিনশ বছর আগে বাংলা দেশ মাত্র সাড়ে তিন টাকায় বাব হাজারখনা দিতে পারত, সে রুমাল নয়। সে কথা ভাবতে চোখ আরো জ্বালাই করতে লাগল। বেরিয়ে এল এক ফোঁটা জল।

সে জলের মধ্যে দিয়ে আবছা একটা ছবি ফুটে উঠল। সত্যিই ত': চোখেব জলে কি কিছু ঢেকে দিতে পারে? ঢাকাই মসলিনে কি সম্রাটনন্দিনী জেবউন্নিসার অঙ্গসৌষ্ঠব ঢাকা পড়েছিল? আওরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন পরা আদরিণী মেয়েকে তার বে-আব্রু পোশাকের জন্য বকেছিলেন। উত্তরে জেবউন্নিসা তার সম্রাট পিতাকে বলেছিলেন, বাবা, তবু ত' আমি মসলিন আট ভাঁজ করে পরে আছি।

না। চোখের জল ইতিহাসের আত্মীয়তা, ভূগোলের নিকটতা ঢেকে রাখতে পারে না। মোটে পনের শ' মাইলের দূরত্ব বাংলা আর রাজোয়ারাতে। এই ত' শ' দুই তিন চার বছর আগেকাব কথা। এই মরুভূমির বালির মধ্যে ট্রেনের বদলে জল ভরা নদীর ধার দিয়ে নৌকোয় চলেছি। সবুজ সবুজ হরিতে-হরিতে ঢাকা সেই গ্রাম। সেই বটতলা। সেই শিরশিরে বাতাস-বওয়া ধানক্ষেত। সেই মেঘে-ঢাকা আকাশ। নদীর এক একটা বাঁকে সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠছে নতুন দেখা পাড়া, নতুন খোলা গঞ্জ। শিলেট থেকে চলেছি সোনারগাঁও—পনের দিন ধরে নৌকোয়। চলেছি গ্রাম আর ফলের বাগানের সারির মধ্যে দিয়ে। পাড়ে পাড়ে জল তোলার যন্ত্র, ফলের বাগান, ডাইনে-বাঁয়ে হেসে উঠছে গ্রামগুলি।

না, না। সে আমি নই, আমি নই। সে সোনার বাংলা দেখবার সৌভাগ্য ত' আমার হয়নি। সে দেখেছিল ছ'শো বছর আগে মিশরের ইবন বটুতা।

॥ ২ ॥

মহারাণীর নেমন্তন্ন।

সুধী পাঠক, আমার পক্ষে কেমন একটা মহা ব্যাপার তা ভেবে দেখ। বিকেলের চায়ে নয়, সন্ধ্যা বেলার এক কাপ কফিতে নয়, ঢালাও দরবারী রিসেপশনে নয়, একেবারে প্রাইভেট লাঞ্চ পার্টিতে নেমন্তন্ন।

সেই দূর মেঘনার পারে, পূব-বাংলার টিনে-ছাওয়া ছোট্ট কুটীর থেকে মরুভূমির মাঝখানে এক মহারাণীর মার্বেল প্যালেস। তুমি গরীব হতে পার, কিন্তু ভক্তি থাকলে ভগবানকে পাবার আশা আছে। তুমি সামান্য হতে পার, তবু মাথার জোরে কোন্ না কোন্ হিটলার রকফেলার বনতে পার। কিন্তু মেঘনার পার থেকে মহারাণীর খাস দরবার? নাঃ। এ হেন তাজ্জব কারবারের একটু-আধটু নমুনা স্বাধীন হিন্দুস্থানের রাজ-ভবনে, রাষ্ট্রপতি-ভবনে শুরু হয়েছে বটে। কিন্তু মহারাণীদের শাস্ত্রে এখনো লেখে না।

আর যে সে মহারাণী নয়! খাস যোধপুরের রাঠোর মহারাণী। তাও শুধু মহারাণী নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী। রাজমাতাও নয়, নাবালক মহারাজার ঠাকুমা দিদাজী বাই। যাঁর স্বামী আর ছেলে দুজনেই রাজত্ব চালিয়েছেন তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে। যাঁর ছোট্ট নাতীটিও যদি রাজপাটে উঠতে পারতেন, তাহলে তাঁরই বুদ্ধির জোরে চালাতেন মাড়োয়ার।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কল্যাণে সব রাজপাট লোপাট হয়ে গেছে। তবু 'রণ-বংকা' অর্থাৎ যুদ্ধে ওস্তাদ রাঠোর রাজবংশের অনেক কিছু বলতেই বোঝায় মহারাণীকে। নেহাৎ পোড়া-কপাল টুয়েনটীয়েথ সেঞ্চুরী না হলে, কোন্ না কোন্ মেরিয়া থেরেসা বা চাঁদ সুলতানার নতুন সংস্করণ হয়ত দেখতে পেতাম মহারাণীর মধ্যে। এই সাদা চোখেই।

এ হেন মহারাণী নেমন্তন্ন পাঠালেন আজ ভোরবেলা। শুধু তাঁর নিজের ছেলে-মেয়েরা আর কয়েকজন অন্য রাজ্যের অতিথি মহারাণীরা থাকবেন। আর আসবেন আমার নতুন চেনা রাজাসাহেব আর তার ভাই ঠাকুর সাহেব। রাজাসাহেবের 'ঠিকানা' অর্থাৎ জায়গীর হচ্ছে মাড়োয়ারের সীমানায়। বার

বার মোগল-পাঠানকে, জয়পুর বা মারাঠাকে এই রাজ্যে ঢুকতে হয়েছে তার ঠিকানাতে প্রথম রক্তটীকা পরে। রাঠোরের প্রথম দেউড়ী হচ্ছে কুঁচামন।

সেখানকার কেল্লায় থরে থরে ছড়ান আছে তাদের বংশ-পরিচয়। রক্ত দিয়ে তা লেখা, জান দিয়ে তা কেনা। দুষমনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পাগড়ী, পোশাক আর পতাকা। হরেক রকমের হাতিয়ার।

আর তার পাশে আমার হাতিয়ার বলতে এক হাজির করতে পারি এই কলমখানা। যেটি নিয়ে নাড়া-চাড়াই রাজস্থানে আমার পরিচয়। তবে বাংগালীর কলমের উপর রাজপুতের শ্রদ্ধা আছে। সে কথাই মহারাণী স্মরণ করেছেন তাঁর চিঠিতে। মাথা উঁচু হয়ে উঠল তা পড়ে। রাজপুতেরা তাদের বীরত্বের বাহাদুরী দেখাত গোঁফে চাড়া দিয়ে। স্বীকার করছি গোপনে যে, এতদিন পরে গোঁফের অভাবটা অনুভব করলাম।

কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে এল বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই সম্মানে। আমার মাটির মা। কিন্তু কলমে সোনা ঝরায়।

এমন সময় মালী ঘরে রেখে গেল এক গোছা গোলাপ। হ্যাঁ, মরুভূমিতে গোলাপ।

এগিয়ে এসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম। গোলাপের মিঠে গন্ধ মনকে আরও উতলা করে তুলল। মনে পড়ল আরেকটা মরু দেশের কথা। 'আরবের খলিফা অল-মুতাওক্কেল বলেছিলেন—আমি হচ্ছি সুলতানদের সেরা, আর গোলাপ হচ্ছে ফুল-বাগিচার রাণী। অতএব আমরা দু'জনে হচ্ছি দু'জনার সবচেয়ে উপযুক্ত সাথী।

আজ আমিই বা ওই খলিফা বাদশার চেয়ে কম কিসে?

হ্যাঁ। আমাব চেয়েও অবশ্য বড় বলা যায় ওই আরব দেশেরই এক তাঁতীকে। অল-মাসুম খলিফার সময় এক তাঁতী গোলাপের মরশুমে কাজ করাই ছেড়ে দিয়েছিল। ভোর থেকে সে শুরু করত শিরাজী আর গাইত, "ওরে গুলাবের সময় এল। এবার তুই যত দিন তার কুঁড়ি আছে আব ফুল আছে, শুধু শরাব পিয়ে যা।" গোলাপের যখন মরশুম ফুরিয়ে গেল, তখন কাজ আরম্ভ করবার আগে সে গাইত,—

"ওরে, খুদাতালা যদি আবার গুলাবের মরশুম আসাতক আমায় বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে আবার শরাব দিয়ে শুরু করব। কিন্তু তার আগেই যদি মরি, তাহলে বেচারা গুলাব আর শরাবের জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল রেখে যাচ্ছি।'

তবে খলিফাও কম খলিফা লোক ছিলেন না। গোলাপের সমঝদারীতে একটা জোলা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে? আচ্ছা, আমিও জানি গুণীকে কি করে কদর করতে হয়। ওকে গোলাপের মরশুমে দিল দরিয়া হয়ে ফূর্তি করবার জন্য বছরে দশ হাজার দিরহম পেনসনের পরোয়াণা দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মহারাণীর নেমন্তন্ন। তাতে আসছেন আরো গুটি কয় মহারাণী। এদিকে এসে হাজির হয়েছে এক গোছা গোলাপ। মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে সারা আরবীয়া। নাঃ! এ আমার কলমে পোষাবে না। শরণ নিলাম তাই কবি আমীর খুসরোর।

"মাতাল খুসরো ঢেলেছে কবিতা-দেবীর পেয়ালা মাঝে,
মধুর সুরারে, শিবাজীরে যাহা হার মানায়েছে লাজে।"

(ন্যু সিফির)

বহু গুণীজনের সকাল শুরু হতে দেখেছি বিয়ার দিয়ে। এ অধম আবার ও রসে বঞ্চিত। নেহাৎ কাব্যরসেই মাঝে মাঝে শুকনো গলা আর মরুভূমির মত মন একটু-আধটু ভিজিয়ে নিতে হয়।

তবু যদি আমার সপক্ষে উকীল দিতে হয়, তবে এই পেশ করছি হাফিজকে।

জ হিদ শরাব-এ-কৌসর ও হাফিজ পিয়ালা খাশ্‌ত্‌।
তা দরমিয়ানাহ্‌ খাশ্‌তো কির্‌দ্‌গার্‌ চীশ্‌ত্‌।

অর্থাৎ

ফকির চাহিল স্বরগের সুধা, হাফিজ পেয়ালা মাগে।
এখনো জানি না আল্লা কাহারে ঠাঁই দেন আগে ভাগে।

খুশী হয়ে কবিতার পর কবিতা মনে করতে করতে এক জায়গায় এসে বাস্তবের ছোঁয়া পেলাম। যেন মেঘনার অথৈ জলে পাড়ি দিতে দিতে বৈঠা-খানা মাড়োয়ারে বালির চড়ায় এসে ঠেকে গেল। ভাবছিলাম—

হৃদয় আমার ময়ূরের মত
নাচেরে।

নাচছে যে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু পেখম মেলবে কেমন করে? মেলে ধরবার মত কোন পেখমই যে নেই সঙ্গে।

লাঞ্চ পার্টি। ডিনার জ্যাকেট যদি সঙ্গে থাকত তাতে চলত না। নয়া জমানার চুড়িদার আর শেরোয়ানীতে গলাখানা এখনো বাঁধা দিইনি। দেবার

সদিচ্ছাও দেখা যাচ্ছে না। অচিরাৎ হবে বলে মনে হয় না। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রাজা সাহেব আর তস্য ভ্রাতা ঠাকুর সাহেবের মূর্তি। ওরা নিশ্চয়ই প্রিন্স-কোট অর্থাৎ গলাবন্ধ কোট আর যোধপুরী পরে মহারাণীর সামনে মাথা হেলিয়ে কুর্ণিশ করবেন। মাথার রঙীন পাগড়ী ওই বীর বপুগুলিকে আরো রঙদার করে তুলবে। ছা-পোষা বাঙ্গালী আমরা ওই প্রিন্স-কোটকেই সাদা-মাঠা ভাষায় গুজরাটি কোট বলে থাকি। এ অধমেরও অমন একখানা কোট আর পাৎলুন সুটকেশের তলায় লুকোনো আছে বটে। কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে, মাথা আমাদের এমনিতেই না কি গরম। সে জন্যেই না কি বাঙ্গালীরা মাথায় কিছু পরে না। পাশাপাশি একই রকম পোশাকে দু'রকম ছবি মনের-আয়নায় ভেসে উঠল। অমনি গলাবন্ধ কোট হল বাতিল।

তবে?

চিঠিখানা আবার ভাল করে পড়লাম। না, পোশাক সম্বন্ধে কোন হদিশই দেওয়া নেই চিঠিতে। তবে শেষ পর্যন্ত একটা ইংরেজী ঢঙের লাউঞ্জ স্যুটই ভরসা হবে না কি?

হঠাৎ চিঠিখানাই কিনারা বাৎলে দিল। নেমন্তন্নে যখন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কথা লেখা আছে, তখন আসল বাঙ্গালী পোশাকই মহারাণী প্রত্যাশা করবেন। এ ত' নয়াদিল্লীর চাকুরিজীবী নয়। এ যে বাংলা দেশের সাহিত্যিক, রবি ঠাকুরের দেশের লোক।

গুরুদেব, তুমি বাংলার বাইরে পৃথিবীর মাঝখানে আমাদের কতো যে বড় করে গেছ, তা আমরা নিজেরাও এখনো ভাল করে জানি না।

তার পরের চিন্তা হল—পর্দা নিয়ে। মহারাণী কি পর্দানশীন? না, সামনে আসবেন? সহজ ভাবে কথা কইতে পাব? থালায় দু' খানা পুরী নিজের হাতে তুলে দেবেন কি? এদিকে আমি পরম খুশীতে দশ দশটা আঙ্গুলে ওরিয়েন্টাল ডান্সের শঙ্খ মুদ্রা করে ফেলব? 'আর দেবেন না', 'আর দেবেন না' গোছের ভাব দেখাব একখানা। ও-দিকে হয়ত অন্য অতিথিরা তার মধ্যে একটা সাহিত্যিকসুলভ 'পোজ' ডিস্‌কভার করে পুলকিত হবেন।

পর্দার আবার নানা রকম মাত্রা আছে। এই যেমন উদয়পুরের মহারাণীর পর্দা। সেখানে পুরুষের প্রবেশ একেবারে নিষেধ। এমন কি, মহারাণীর নিজের ভাই ও বোনেরা দেখা পান শুধু মহারাণার হুকুম আছে বলে। তা-ও এই একজন পুরুষের বেলাই শুধু। কাজেই আমার মহারাণীর সঙ্গে দেখা

হওয়ার কথাই ওঠে না। গেলেন একা শ্রীমতী। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ফিরে এলেন মহারাণীর বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব দেখে। সত্যি সত্যিই মহারাণার সহধর্মিণী। রাজ্যপাট দরকার হলে একাই চালাতে পারতেন। যা কিছু ঘটে, কেন ঘটে? আর না ঘটলে কি হবে? সব কিছু সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল। তার চোখে যে দীপ্তি খেলে তা শুধু হীরে জহরতের নয়, বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধির। তবুও তিনি পর্দা!

এদিকে যে সন্ধ্যায় শ্রীমতী তাব সংগে সাক্ষাৎ করলেন, সে রাতেই তিনি তার শুটিং বক্স থেকে এক গুলীতেই একটা বাঘকে মেরেছিলেন। এ হেন নারীর চোখকে কি আর সামান্য পর্দা ঢেকে রাখতে পারে?

মনে পড়ল মোগল সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কথা। একবার জাহাঙ্গীর শপথ করেছিলেন যে, আর শিকার করবেন না। এদিকে একটা বাঘের উৎপাতে সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছিল। সব চেয়ে বড় বাহাদুর আমীর ওমরাহরাও বাঘটাকে মারতে পারলেন না। তখন রাণী বেগম একটা রাতের চেষ্টায় এক গুলীতেই বাঘকে করেন খতম।

আবার হাফ-পর্দাও আছে। আরেকটা স্টেটের রাজমাতার গল্প। নাতনীর জন্ম-উৎসবে মহাধুমধাম হয়েছিল, আর হাফ-পর্দাব কল্যাণে তিনি নাকি তার সব কিছু আচারেই হাজির ছিলেন। কেমন ধারা প্রথা জানি না। তবে আর একটা উৎসবে তার নমুনা দেখলাম স্বচক্ষে। একটা বড় বৈঠক বসেছে প্রাসাদে আর বাজনা বাজছে ভারি মিঠে। রাজমাতার কাছে এসে শোনার সাধ হল। একটা পর্দার আড়াল তৈরী করা হল। তার পেছনে তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে ঠাঁই নিলেন। কিন্তু বাজনা বাজছে ভারি মিঠে। আরো কাছে না এলে চলে না। নিজেই উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলেন আরো একটা পর্দা আছে। বাজনদারদের কাছে। দুটোর মাঝখানে তৈরী করা হল গোটা দুই চেয়ারের আড়াল। পাঁচজনের চোখের সামনে দিয়েই দে ছুট কাছের পর্দাটার পেছনে। দৌড়োদৌড়ি করে কার্পেটে বসে পড়তে না পড়তেই তাঁর ক্ষিদে পেয়ে গেল। ঝক্‌ঝকে রুপোব-থালার মিঠাইগুলো নিঃশেষ হওয়ার পর, থালাতে ঘোমটার ভেতর থেকে রাজমাতার তৃপ্তির ছায়া কেমন ফুটে উঠেছিল, সে খবরটা অবশ্য আমাদের অজানাই রয়ে গেছে।

নলচের আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া কাকে বলে, সুধী পাঠক, এবার নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ।

আহা! টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি। আর পর্দার চেয়ে হাফ-পর্দা। কেমন একটা আলো-আঁধারি ভাব। শোনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। দেখা যায় ত' ছোঁয়া যায় না। যায় যায়, তবু সব যায় না। সংসারের সবসে সেরা রোম্যান্স।

বিশ্বাস না হয় চলে এস আমার সঙ্গে শাজাহানের দিল্লীতে। বেগম সাহেব অর্থাৎ জাহানারা তার প্রাসাদ থেকে রওনা হয়েছেন দরবারে যাবার জন্য। অন্ত নেই জাঁক-জমকের; সোয়ার, সেপাই আর খোজাদের ঠমকের। খোজারাই বেগম সাহেবের সব চেয়ে কাছে থাকার কপাল নিয়ে জন্মেছে। তারা যে হাফ-পুরুষ! সামনের, ডাইনে-বাঁয়ের সবাইকে হঠিয়ে দিচ্ছে চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়ে। দরকার হলে পিটিয়ে পর্যন্ত। তা সে যত মানী-গুণী লোকই হোক না কেন। পিছনে ছোটি-বেগমদের বয়ে নিয়ে চলেছে ঘেরাটোপগুলি। সামনে ছিটোচ্ছে গোলাপ-জলের ধারা। যাতে ধুলো উড়ে তাঞ্জাম পর্যন্ত না পেঁছোয়। তাঞ্জাম মিহি সোনার ঝালর দিয়ে ঘেরা। তার উপর বসান সোনার মিনা করা কাজ, এমন কি দামী জহরৎ। সোনার পাতে মোড়া হাত-পাখা, ময়ূরের পালকের। হাতী চলছে দুলকী চালে, ঠমকে গমকে। কিন্তু তাতারিণীদের হাতে ময়ূরপঙ্খ দুলছে আরো বিলম্বিত তালে। দীন-দুনিয়ার মালিকের ঝিয়ারী তুলো-ধোনা মেঘের আড়াল থেকে আকাশের চাঁদ এই একটুখানি দেখে নিতে চান।

অমনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল আমাদের মধ্যযুগের মোগল নাইট। শ' দুই পা দূরে দাঁড়িয়ে হাত দু'টি রাখল বুকের উপর, যতক্ষণ না বেগম-সাহেব একেবারে সামনে পেঁছচ্ছেন। তারপর করবে লম্বা এক কুর্ণিশ প্রায় ভুঁয়ে ছুঁয়ে।

রাজকন্যা কি কিছুই নজর করেন নি? না। সবই তিনি দেখেছেন, নিজেকেও দেখিয়েছেন। যদি মেহেরবাণী হয ত' দেবেন পাঠিয়ে জহরতের কাজকরা সোনার ব্রোকেডের বটুযা। তাতে আছে পান আর তাম্বুল।

রোশনারাও কম যেতেন না। জাঁকজমকে তিনি বড় বোনকে ছাড়িয়েই গিয়েছিলেন। তাঁর বিরাট হাতীর উপরে চড়ান তাঞ্জামটার নাম ছিল পীতাম্বর। সোনা দিয়ে মোড়া ছিল তার আসন, আর চাঁদোয়াটা ছিল যেন একটা সিংহাসনের উপরে সাজান। দেড়শ' জন রঙ-চঙে রসিকা তাতারিণী চলত তার পাশে পাশে। পিছনে চলত কত পাল্কী, তার লেখা-জোখা নেই। কিন্তু সবারই ঢাকনা হচ্ছে শুধু ফিনফিনে জরির ঝালর। উড়ু উড়ু করে তারা। আর দুরু দুরু করে আরোহিণীর বুক।

এ হেন পর্দার আড়ালে যিনি আছেন, তার কাছ থেকে কি পেয়েছি আর কি পাইনি, তার হিসাব কষে দেখতে যাবে পৃথিবীতে কোন্ আহাম্মক? কোন্ বেরসিক? কবি ঠিকই গেয়েছেনঃ—

নয়নে নয়নে যদি, হৃদয়ে হৃদয়ে
বালির বাঁধ রোধে কি হে
অসীম সলিলে?

পর্দা আর হাফ-পর্দার মধ্যেকার মিহি ওড়নার আড়ালটুকু মনে মনে নাড়াচাড়া করছি। মনে পড়ল আগের দিন যোধপুরের ঢাই পাহাড়ী কেল্লাটার উপর থেকে দেখা রাণী পাড়া। অবশ্য চমকে উঠেছিলাম রাণী পাড়া নামটা শুনে। আমরা বাংলা দেশের গায়ে ভুয়ে এমন কি শহরেও বামুন পাড়া, ধোবি পাড়া এ সব অঞ্চলের কথা শুনে এসেছি। কিন্তু তা বলে রাণী পাড়া!

হ্যাঁ! ঠিক তাই। একজন মহারাজা হয় ত' সাতাশজন রাণী, আর সাতান্নজন উপ-রাণী, থুড়ি, হাফ-রাণী, আর তিনশো তেষট্টিজন নেক-নজরাণী রেখে রাজ-পাটের মায়া কাটিয়ে ফেললেন। তা বলে তারপর যিনি গদীতে বসছেন বা দখল করছেন তিনি কেন এত জনের মোটা মাসোহারা গুণতে যাবেন? তাদের রাজ-বাড়িতে বা তার আনাচে-কানাচে ঠাঁই দিতে যাবেন? নয়া মহারাণী, হাফ-রাণী প্রভৃতিদের দাবিই ত' তখন সকলের আগে। কাজেই চাঁদ অস্ত গেলে তার রোহিণী ভরণীদের আস্তানা হয় যেখানে, তার নাম হচ্ছে রাণী পাড়া।

আজকের দিনে শ্রেণীহীন সমাজ অর্থাৎ ক্লাশলেস সোসাইটি গড়বার জন্য অনেকে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। তাঁদের চুপি-চুপি জানিয়ে রাখি যে, এই নিভন্ত বাতির মিছিলেও এই শ্রেণী বিভাগের অবিচারটা কায়েম হয়ে বসে আছে।

একটা স্টেটে দেখলাম যে সেখানকার বাই-সাহেবার বিগত মহারাজার সঙ্গে ঠিক যে কতটুকু বিয়ে হয়েছিল তা কেউ জানে না। পাত্র মিত্রদের একটু আড়ালে-আবডালে শুধোতেই তারা ফিস-ফিস করে শুধু জানালেন যে, রাজ-রাজরাদের হিন্দু বিয়েতে মাত্রা ভেদ আছে। ঠিক হোমিওপ্যাথী ওষুদের ডাইলিউশন ভেদের মত আর কি।

একটু পরেই সে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী একলাটি পেয়ে ব্যাপারটা আরো একটু খোলসা করে দিলেন। শুধু রাণী কেন, রক্ষিতাদের মধ্যেও রকম ভেদ আছে, রুপো রাণী, সোনা রাণী এমন কি হীরে রাণীর মত সোনা বাই হীরে বাই আরো সব কত কি।

এ হেন শ্রেণী বিভাগে ভরা আবহাওয়ার মাঝখানে দিদাজী বাই ছিলেন তাঁর স্বামীর রাজপাটে একেবারে একেশ্বরী। ছিল না আকাশে কোন অশ্বিনী ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণীর আনা-গোনা, কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া চন্দ্রগ্রহণ। মহারাজা উম্মেদ সিংয়ের সুখে দুঃখে সমভাগিনী। সঙ্গিনী উৎসবে ব্যসনে চৈব।

একবার বর্ষাকালে হঠাৎ পাহাড়ী মরু নদীতে বান ডাকল; বড় সাধে গড়ে তোলা ছবির মত যোধপুর শহর ভেসে যায় যায়। গহীন রাতে বাঁধ দেবার চেষ্টায় বেরিয়ে এসেছেন মহারাজা নিজে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কর্মিদের উৎসাহ দিচ্ছেন নিজে দীদাজী বাই। তখন তিনি নিজেই মহারাণী। কিন্তু নেই তাঁর ঘোমটার আবরণ, পর্দার আব্রুর কোন চিন্তা। সত্যিকারের রাজপুতানী, রাজসী।

তাঁর অতীত জীবনের মহারাণীত্বের কাহিনীতে উৎসাহ দেখাচ্ছি দেখে দীদাজী বাইয়ের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বলে চললেন, একটির পর একটি অতীতের কাহিনী। যে স্বামী আজ নেই, যে রাজপাটও আজ নেই, তাদের কাহিনী। অতীতের এই রোমন্থনে ছিল না কোন ব্যথা, কোন অভিযোগ। যারা সত্যি সত্যিই নিজেদের রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের যে কতখানি ছিল আর কতখানি গেছে তা মনে করে এই বীর নারীকে মনে মনে করলাম একটি নমস্কার।

সামনে খাঁটি রাজপুত ধড়া-চূড়া পরে দাঁড়িয়ে আছে বাটলার। হাতে তার তরমুজের রস। মহারাজকুমার অর্থাৎ মাত্র বছর দেড়েক হল যে যুবক মহারাজা এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, তাঁর ছোট ভাই—অনুরোধ করছেন একটু তরমুজের রস খেতে। পরনে তার যোধপুরী ব্রিচেস্ আর কোমরে বাঁধা একটা রাজপুত ছোরা আর বিরাট এক পিস্তল। পিস্তল আর ছোরা দুই-ই মহারাজার নিজের অস্ত্রশালায় তৈরী। কিন্তু আমি যে ছোরাটির দিকে তাকিয়ে আছি, তা সে কারণে নয়। এই তরমুজ আর এই ছোরা আর সোফার পাশে বসে রাঠোর মহারাণী। বছরের পর বছরের পর্দাগুলি সরে যেতে লাগল।

শাজাহানের রাজত্বের শেষ কাল। চার ছেলেতে চলছে তুমুল লড়াই। যুবরাজ দারার পক্ষে লড়েছিলেন যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। নর্মদা তীরে হেরে ফিরে এসেছিলেন যোধপুরে। কিন্তু কেল্লার ফটক বন্ধ করে রাখলেন মহারাণী মহামায়া। তার চোখে স্বামী মারা গেছেন। রাজ-পুতানীর স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে ঢাল বয়ে! না হলে ঢাল তাকে

অর্থাৎ তার মৃতদেহকে বইবে। রাজপুতানী হয়ে মহামায়া কি করবেন এ অবস্থায়?

এ হেন অবস্থা সম্বন্ধে চারণ কবিতায় আছেঃ—

খগ তো অরিয়াং খোসলী, পিউঘর আয়া ভাজ।
জিন খুঁটি খগ ঠাং তা, উন পর ঠাংকো লাজ॥

দুষমন তোমার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছে, আর হেরে গিয়ে প্রিয় ঘরে পালিয়ে এসেছে। যে খুঁটিতে তলোয়ার টাঙিয়ে রাখত, সেখানে এখন নিজের লজ্জা টাঙিয়ে রাখতে হবে।

বীর নারী এখানেই ক্ষমা দেন নি।

পিউ কায়র হোতা মহল, হুঁ হোতী সিরদার।
হুঁ মরতী থে নংহ বলত, দুখ তো লায়ো লার॥

যদি আমার কাপুরুষ স্বামী স্ত্রী হত, আর আমি হতাম সর্দার, তা হলে নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিতাম। তার পর আমার মৃত্যুতে সে যদি সতী না-ও হত তাতে এমন আর বেশী কি আফসোস হত?

মহামায়া তারপর স্বামী মারা গেছেন এই ধরে নিয়ে চিতা সাজাতে হুকুম দিয়েছিলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, আবার বীরের মত যুদ্ধ করতে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে, যশোবন্ত সিং সে যাত্রা স্ত্রীকে সামলে নিলেন। কিন্তু হায়, ভাঙা কাচ আর ভাঙা হৃদয় ত' জোড়া লাগে না।

একদিন মহারাজা ভোজনে বসেছেন। পাশে হাত-পাখা নাড়ছেন স্বয়ং মহারাণী। দাসী এনে দিল এক টুকরো তরমুজ আর তা কাটবার জন্য একটা ছুরি। ছুরির মত ধারালো ঠাট্টা করে উঠলেন মহারাণী। সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও ছুরিটা তাড়াতাড়ি; মহারাজা আবার ছুরি-ছোরা-দেখে মুচ্ছো যেতে পারেন।

ডাইনিং রুমে এসে বসলাম আমরা। এটা নীচের তলায় ব্যাংকোয়েট রুমের মত বড় নয়। এখানে জাঁকজমক আর আদবকায়দার ভিড়ে দিশেহারা হয়ে হারিয়ে যেতে হবে না। তবুও এত ভাল আর দামী আসবাবে সাজান ঘরে বসে খেলে আটপৌরে বাঙ্গালী জীবনে এ খাওয়া হজম হবে কি না কে জানে। কিন্তু মহারাণী টেবিলের 'হেডে' অর্থাৎ মাথায় বসে আমায় বসিয়েছেন নিজের ডান হাতে। খুব সহজ সরলভাবে আপনার জনের মত করে নিচ্ছেন। ওদের নিজেদের একজন হয়ে গেলাম।

ওদের নিজেদের খাবার জিনিসগুলিই খেতে অনুরোধ করলেন বার বার। গত ক'দিন রোজ রাজপুত ভোজ খেয়েছি একটানা। কুচামনের হলদে পাথরে গড়া প্রাসাদে দোতলায় খুব আদর আপ্যায়ন করে রেখেছিলেন ওরা আমায়। আমাকে দেওয়া ঘরগুলির ঠিক পাশেই ওদের গোল-কামরা। সেটি পেরিয়ে ওপারের মহলে ঢুকলেই সামনে সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে রাজপুত মহিলাদের। কিন্তু সূর্যিমামা যদি তাদের মুখ দেখতে মোকা না পান, এ দীন আর কেন করবে সে চেষ্টা?

সেই মধ্যযুগের ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে চক্কর মারতে মারতে নীচে নেমে এসে যখন খাবার ঘরে বসতাম তখন মনে হত যে, টেবিল-চেয়ারগুলিও যেন সেখানে তেমন মানায় না। মানায় শুধু রাঠোর ধাঁচের পাগড়ীপরা খানসামায় পরিবেশন করা রাজপুত খানা। প্রাণপণে সেই ঘি মশলা আর মাংসের জাফরানি দরিয়ায় পাড়ি দিয়ে যেতাম রোজ। বাঙালী পেট বলে ত্রাহি ত্রাহি। বাঙালী বুকের পাটা বলে—কভি নেহি। হার মানব—সে কভি নেহি। খেয়ে যাব রোজ, এই গুরুভার রাজপুত খাবার। করি না তোয়াক্কা হজমের। বীরের দেশে এসে আর কিছু না পারি, নিদেন পক্ষে বীরের মত খাব।

না খেয়ে উপায় কি? লক্ষ্ণৌয়ের বন্ধু আহমেদ আলী আজ করাচীতে। পাকিস্তান সরকারের একটা কেউকেটা ব্যক্তি ছিলেন। বড় দুঃখেই গোপনে বলেছিলেন একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। অমন মরমে-মরা কাহিনী ত' সহজে ভুলে যেতে পারি না: বন্ধু আমার গিয়েছিলেন ফ্রণ্টিয়ারে, তার এক শিনোয়ারী কলেজের সহপাঠীর অতিথি হয়ে। কিন্তু যেদিন ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে গিয়ে পেঁছোলেন, সেদিন ভোরেই তার বন্ধু কাজে ঠেকে চলে গেল দূর একটা গ্রামে। ঘরে বেগমকে বলে গেল, যেন দোস্তকে খুব ভাল করে খাওয়ান হয়। পর্দার আড়াল থেকে শ্রীমতী ইয়া গোটা দুম্বা থেকে আরম্ভ করে যা পর্বতপ্রমাণ খানা পাঠাতে আরম্ভ করলেন, তার প্রতি সুবিচার করা একটা কেন সাতটা আহমেদ আলির সাধ্যে কুলোয় না। পর্দার আড়াল থেকে এল বহু অনুনয়. শেষ পর্যন্ত আফসোস যে. বেগমসাহেবার পাঠান খানা লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেবের মোটেই মর্জিমাফিক হচ্ছে না। তা না হলে সর্ব' দেবময় যিনি অতিথি. আবার তার উপর স্বামীর বন্ধু. তিনি কি না কিছুই খেতে পারছেন না। বেগমসাহেবা পর্দার ওপার থেকে আফসোসে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি অতিথির সামনে বেরিয়ে এলেন। নিজে সামনে থেকে অতিথি সৎকার করতে শুরু করলেন। আর আহমেদ আলি প্রাণভয়ে লুকিয়ে খেতে লাগলেন কাবুলী হজমী গুলী।

ইতিমধ্যে কর্তা গ্রাম থেকে ফিরে এসে মহা খাপ্পা। তাজ্জব ব্যাপার। বৌ এই দু'দিনেই বনে গেছে বেহায়া, বে-আব্রু। পাঠানের শাস্ত্র আর সমাজ দুই-ই যে যায় জাহান্নমে।

পর্দার ওপার থেকে স্বামী-স্ত্রীর তকরার ভেসে আসতে লাগল কানে। আহমেদ আলি ত' লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে যেতে লাগলেন। তবু মরার উপর খাঁড়ার ঘা যে কি, তা তখনো বেচারা জানতেন না।

বন্ধুপত্নী চেঁচিয়ে মহল্লা মাৎ করে গজরাচ্ছেন। এই চিড়িয়া, তোমার ওই হিন্দুস্থানী দোস্ত, ও আবার পুরুষ হ'ল কবে থেকে। একটা বুলবুলি যা খেতে পারে, তা-ও যে সামাল দিতে পারে না, তার সামনে বের হলেই কি বে-পর্দা হতে পারে কোন আওরৎ?

গোঁফ ছিল না আহমেদ আলির। সরু কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে মনে মনে বললেন—আল্লাকে ধন্যবাদ, মাঝে মাঝে আমি কানে কম শুনি।

কুচামন আর তার বন্ধুদের সঙ্গে রোজ খেতে বসি আর আহমেদ আলির কথা মনে করি। প্রাণটা আইঢাই করে। নিদেন পক্ষে একটুখানি বিলিতি জোলো সুপ আর লড়াইয়ের সময় থেকে চালু করা তিন কোর্স ডিনার একদিন পেলে তবু ত' ভেতো পেটটা একটু জিরোবার ফুর্সৎ পায়।

এমন সময় একদিন হাজির হলেন মাস্টার সাহেব। রাজপুত স্কুলের হেডমাস্টার। বুড়ো হাড় কিন্তু কাঁচ মন। তার স্কুলে কেতাবী বিদ্যার সঙ্গে কেমন করে ভাল সৈনিক আর সামরিক অফিসার হওয়া যায়, তা শেখান হয়। শুধু পড়ুয়া হলে ত' আর জান দেওয়া-নেওয়ার কারবারে পাকা হওয়া যায় না।

এ হেন মাস্টার সাহেব আমায় বিরাট এক টুকরো মাংস আর পেস্তার পোলাওয়ের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। বাটলারকে পারলে দু' ঘা কষিয়েই দেন আর কি। তার সামরিক স্কুলের সব বিদ্যাটাই কি নেহাত মাঠে মারা যাবে? ব্যাটা এত ফাঁকিবাজ যে রাজা সাহেবের অতিথিকে শুধু দেশী খানা খাওয়াচ্ছে। কেন? আজ একটু "পুলে

পোলোনেজ" (পোলিশ কায়দায় রান্না মুর্গী) নিজে বানিয়ে আনলে রাজা সাহেব ত' খুশী হতেনই, তার বিদেশী অতিথিরও মুখ বদল হত।

যে 'ব্যাটা' বাটলার শুধু বিলিতি বা কন্টিনেন্টাল কায়দায় মুর্গী বানাতে জানে তাই নয়, তার পোশাকী ফরাসী নামও জানে, সে কি উত্তর দেয় তা শুনবার জন্য কান খাড়া রাখলাম। পাগড়ীর হিমালয়খানা শুধু পুরোপুরি নুইয়ে তেন সিং ফিস ফিস করে জবাব দিল। রাণীসাহেবা তার অতিথির জন্য নিজে হাতে রোজ খানা রাঁধছেন; রোজ চার বেলা। কর্তার বাটলার বা সদরের বাংলানো মেনু দিয়ে বিদেশী অতিথির অসম্মান করা চলবে না।

সে কথা মনে পড়ল। দু' পাশ দিয়ে বাটলারের দল থালি আর ডিস হাতে নিঃশব্দে আনাগোনা করছে। কারো হাতে দেশী খানা, কারো হাতে বিলেতী। কিন্তু বিলেতীগুলো সবই চালান যাচ্ছে টেবিলের ওধারে। কুচামন আর অন্যান্য পাত্রমিত্ররা সেদিকটা জাঁকিয়ে বসেছেন। এমন কি আমার ডান-পাশে যে মহারাণী অব—। সারা ঘরটা আলো করে বসে আছেন, তিনিও ফরাসী অরদোভর (জলপাই, বীট, বিন, পীজ প্রভৃতি সুস্বাদু সব্জি, ককটেল, সসেজ, সার্ডিন মাছ, ডিম সিদ্ধের টুকরো, আঞ্চোভি, হরেক রকমের ড্রেসিং এ সব পাঁচ মিশেলী দিয়ে তৈরী কন্টিনেন্টাল খানাবাহিনীর অগ্রদূত) দিয়ে শুরু করেছেন। কিন্তু খাস স্বদেশী মাড়োয়ারী খানায় মশগুল হয়ে আছেন শুধু দিদাজী বাই নিজে। আর তিনি খুব যত্ন আত্যি করে সেই ভুরি ভুরি মাড়োয়ারী ভোজ নিজে হাতে পরিবেশন করে দিচ্ছেন আমার পাতে।

হায়! কোন মহারাজা কি ইহজগতে কখনো এত সুখ পেয়েছেন খেতে বসে?

কি সুধী পাঠক, অবাক হয়ে যাচ্ছ না কি?

অবাক হবার কথাই বটে। এত মালদার চব্যচোষ্য যাকে বলে সবই হাজির; তবু খেয়ে সুখ নেই!

কিন্তু কেমন করে পাবেন তারা নিশ্চিন্ত মন?

তাঁদের প্রত্যেক খানাই পরিবেশনের আগে এক জনকে চেখে দেখতে হয়। কি জানি যদি বিষ মেশান থাকে। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাজাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে ফেলার প্রথা খুব চালু ছিল। এশিয়াতে, এমন কি প্রাচীন গ্রীস রোমেও কৌটিল্য-শাস্ত্রের এই নীতি সর্বদাই রাজা-হলেও-হতে-পারি ওস্তাদরা গদীয়ান রাজাদের মনে করিয়ে দিতেন। সেজন্য সব দেশেই এক জন বা তার চেয়ে বেশী চাখনদার থাকত বাঁধা মাইনেতে। উদয়পুরে রাজ রান্নার ডিপার্টমেন্টে একটা

লোহার ক্রশ মার্কা শিকলী দুটো থামের উপর দিয়ে ঝুলছে। সেটা জয়পুরের সোয়াই রাজা জয়সিংহ আড়াইশো বছর আগে মহারাণাকে উপহার দিয়েছিলেন। রাঁধুনীশালায় খাবারে বিষ মেশান হচ্ছে কি না তা নাকি এই যন্ত্রে জ্যোতিষ বিদ্যায় ধরা যেত। তাতে নাকি নানা রকম তুক-তাক মন্ত্রও পড়া ছিল। এ যন্ত্রটা এখন আর কেজো অবস্থায় নেই। কিন্তু থাকলেও চাখনদারের চাকরিটা মারা যেত না।

দুই বিরাট খানার চুপড়ী বাঁকের দুধারে চাপিয়ে চলেছে রান্নাঘরের ভাঁড়ী। চুপড়ী দুটি ক্যাম্বিশে ঢাকা, দড়িতে বাঁধা আর শীলমোহর করা। পিছনে পিছনে চলেছে দরবারের চাখনদার। তা মহারাণার অন্ন চেখে দেখার কাজটা ওর পক্ষে খুব যুৎসই হয়েছে সন্দেহ নেই। কেমন হাসিখুশী, দিলদরিয়া। কেমন ভুঁড়িখানা উপচে উঠছে। যেন সাগর বেলায় ঢেউ।

কিন্তু চাখনদারের কাজ অত নিশ্চিন্ত আরামের নয়। সম্রাট বাবরের খানায় একবার বিষ মেশানো হয়েছিল। তার শত্রু ইব্রাহিমের মায়ের কারসাজি। বাবর তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "চাখনদারকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবার হুকুম দিলাম আর বাবুর্চির গায়ের চামড়া জীবন্তে তুলে ফেলতে। একজন মেয়ে লোককে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে আর একজনকে কামানের সামনে শেষ করে দিতে হুকুম দিলাম।"

কিন্তু আজ মহারাজারা হারিয়েছেন তাঁদের মুকুট। আর সংগে সংগে তার হাজার ঝামেলা দুশ্চিন্তা। ইংরেজীতে কথাই আছে, "আন্ইজি লাইজ দি হেড দ্যাট উয়ারস দি ক্রাউন।"

'বাটিয়া' অর্থাৎ বাজরার মোটা ঘি-চপচপে চাপাটি আর 'সইতা' অর্থাৎ মাংস আর বাজরার খিচুরীর কোর্সটা শেষ করে কোমরের বাঁধনটা কি করে কৌশলে একটু ঢিলে করা যায় তা ভাবছি, এমন সময় এল রসোমালাই। কলকাতাই সাইজ নয়। একেবারে পর্বত প্রমাণ। অন্ততঃ দাংগা-হাংগামার সময় কাজে লাগার মত দশাসই।

মহারাণী খুব খুশী মনে অন্ততঃ একটু চাখতে অনুরোধ করলেন। বললেন যে, যদিও কলকাতায় এ মিষ্টির জন্ম, এর ডেভেলপমেণ্ট অর্থাৎ উন্নয়ন হয়েছে মাড়োয়ারে। নিজের মুলুকের জিনিস পছন্দ করব বলে তিনি এটা বিশেষভাবে আজ বানাতে বলেছিলেন।

চার দিকে মিষ্টি রসালাপ আর গয়না-পোশাকের জৌলুষ। হীরেমাণিক দেখি, না রূপের ছবি দেখি। একবার কেন জানি না উপরে প্রকাণ্ড বেলজিয়ান

কাটগ্লাসের ঝাড় লণ্ঠনগুলির দিকে তাকালাম। আজকের দিনের নিজের মুখের জায়গায় সেখানে ভেসে উঠেছে আমার কিশোর মুখের ছায়া।

সে কিশোর তখন লণ্ডনে। সামান্য স্কলারশিপের টাকার ভরসায় ইউনি-ভার্সিটিতে ঢুকেছে। থাকে মামুলী এক বোর্ডিং হাউসে। সংগী আছে আরো দু'জন। একদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ থেকে ফিরে দেখে, এক জন চাটগাঁয়ের লোক একটি সুন্দর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে নিয়ে তার ঘরে বসে আছে। উদ্দেশ্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা। খাস চাটগেঁয়ে টান দিয়ে সে ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে বলে গেল, সে কেমন করে লস্কর হয়ে এদেশে এসে বিয়ে-থা করে সংসার পাতে। এখন আর পেট না চললেও মা ষষ্ঠীর কৃপা ঠিকই চলছে? অতএব.........

বন্ধুদের মায়া পড়ে গেল লোকটার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটির উপর। বেচারীর ত' কোন দোষই নেই। অথচ তার শুকনো মুখখানা ভারতীয় অক্ষমতার ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। স্বদেশপ্রেমে মরিয়া হয়ে তিন জনেই তখনকার মত যথাসাধ্য বেশ কিছু দিয়ে সাহায্য করল। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের জন্য তখন অনেক স্বদেশীয় মহারথী লণ্ডন জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে গুটি কয়েক জোরাল আবেদনও লিখে দিল তারা।

পরের সপ্তাহে আবার চাটগাঁ এসে হাজির, বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে। না, আর কোথাও সাহায্য মিলছে না। আর পরের সপ্তাহে আবার। তারো পরের সপ্তাহে। শেষ পর্যন্ত তিন বন্ধুতে ঠিক করল যে, ভিক্ষা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। চাটগাঁকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। অনেক খুঁজে শুধিয়ে জানা গেল যে, ঠেলা গাড়ি করে ফল বিক্রিই সব চেয়ে কম পুঁজিতে স্বাধীন ব্যবসার উপায়। কিন্তু কোথায় পুঁজি?

শেষ পর্যন্ত তিন বন্ধুতে মিলে নিজেদের মাসোহারার প্রায় সবটা টাকা এক সংগে করে চাটগাঁর হাতে তুলে দিল। নিজেদের পকেট অবশ্য হয়ে গেল গড়ের মাঠ, কিন্তু এক জন স্বদেশবাসী ত' নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তিন তিনটে কচি শুকনো মুখে রুটির বন্দোবস্ত হবে।

তার পর থেকে শুরু হল তিন বন্ধুর অনশন অর্ধাশনের তপস্যা। পরের মাসের প্রথম দিকে দেশ থেকে নতুন মাসের খরচের টাকা আসবে। সে পর্যন্ত ত' চালিয়ে নিতেই হবে। বিলেতে আবার ধারে কারবার নেই। আর ধার যদি নেয়ই তাহলে আদর্শের জন্য স্বার্থ ত্যাগটা হল কোথায়? তাই সম্বল হল, শুধু

একটা গল্প এ'রা বললেন। শুধু গল্প নয়, 'ফেবল' অর্থাৎ নীতিকথার গল্প। আমরা এ কালে রোদে গলে গিয়ে, বাদলায় ছাতা মেরে, শীতে জবুথবু হয়ে যাবার ভয়ে বাংলা দেশের বাইরে কোথাও একটি পা-ও নড়তে রাজী নই। যেমন করেই হোক, নরম-সরম মোলায়েম আবহাওয়ার মধ্যে ভিড়ে গুঁতো-গুঁতি করে চিড়ের মত চ্যাপ্টা হয়েই থাকব। তবু বেপরোয়া হয়ে ঘরের বাইরে পা ফেলতে ভরসা পাই না। বরাতের সঙ্গে খালি হাতে লড়ে যাবার মত বুকের পাটা নেই আর। ভুলে গেছি যে, এই মাত্র বছর পঞ্চাশ আগেও আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার দল সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছেন। নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিয়েছেন। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেননি, সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। সেই বাঙ্গালীর গল্প, সে ত' শুধু গল্প নয়। সে হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের বচন। সুবচন।

চ্যাটার্জি মশায় ত' এলেন উদয়পুরে। রাজ-সরকারে বড় কাজ নিয়ে। সে কাজটি তিনি পেয়েছিলেন বাঙ্গালীর বিদ্যা আর বুদ্ধির জোরে। কিন্তু বাঙ্গালীর আয়েসী স্বভাব যাবে কোথায়? মহারাণা ফতে সিংহ যে সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সেও সেই মরু-দেশের গরমে দুপুর রোদ্দুর মাথায় নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে রোজ বুনো শুয়োর আর পাগলা হাতী শিকারে বেরোন, সে ব্যাপারটা চ্যাটার্জি মশায় ভাল করে তলিয়ে দেখলেন না। গরমের দিনে মাত্র একটু আরামে কাজ করবার জন্য অফিস কামরার দরজায়—ডেজার্ট কুলার নয়, এয়ার কণ্ডিশনের মেশিন নয়—মাত্র একটি সামান্য খস্‌খসের টাট্টি লাগিয়ে নিলেন।

দুপুরে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বের হবার সময় দূর থেকে ফতে সিংহ ব্যাপারটা এক নজরে দেখে নিলেন শুধু।

পরের দিন ঠিক দুপুরে মহারাণার কাছ থেকে এত্তেলা এল। ঠিক দুপুরে। রাজস্থানের রোদ অবশ্য মাঘের শীতেও মাথার চাঁদি ফাটায়। কিন্তু মহারাণার দেখা দেবার সময় হল না। অত্যন্ত ব্যস্ত তিনি অন্যান্য কাজে। চ্যাটার্জি মশায় রইলেন গ্রীষ্মকালের সেই গরমের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে। বিকেল হয়ে এল, এমন সময় জানলেন যে, আজ আর মহারাণার সময় হবে না।

এমনি করে পরের দিন আবার তলব পড়ল ঠিক দুপুরে। এমনি করেই বাইরে গরমে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু ভেট মিলল

না। ফিরে এলেন ভদ্রলোক। ওদিকে অফিস কামরার দরজার খস্‌খসের বেড়া মনের সুখে ঠাণ্ডা ছড়াচ্ছে।

আবার তার পরের দিন।

তারও পরের দিন।

শেষ পর্যন্ত চ্যাটার্জি মশায় তাঁর দু'একজন ঘনিষ্ঠ মেবারী বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ব্যাপারটা কি মশায়? রোজই মহারাণা তলব করেন ঠিক দুপুরে, ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখেন বাইরে সেই বিকেল পর্যন্ত, কিন্তু দেখা করেন না। আবার তার পরের দিন তেমনি করে ডাকেন কাজের জন্য, অথচ কাজটা হচ্ছে না। কি যে এমন জরুরী কাজটা তারও কোন হদিস পাওয়া গেল না। বড় ঘোলাটে ব্যাপারই বটে!

সব সাফ হয়ে গেল—যখন একজন বন্ধু মাথা ঠাণ্ডা করে আবিষ্কার করলেন যে, সব অনর্থ হচ্ছে ওই খস্‌খসের পর্দা। যেখানে সবাই, মায় মহারাণা পর্যন্ত, রাজপুতানার গরম মাথায় করে বেমালুম কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে কিনা নতুন এসেই এই ভদ্রলোক আয়েসের বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছেন? যারা নিজের মাথাটা দুষমণের মাথার মতই সস্তা মনে করে লড়াই করতে এগিয়ে যায়, তাদের মধ্যে এ রকম আয়েসের আমদানী হলেই জাতটা গিয়েছে আর কি?

চোখ ফুটল চাটুজ্যে মশায়ের। সর্দার প্রভাস চ্যাটার্জি এর পর থেকে সব রাজপুতের সঙ্গে সমান তালে কষ্ট সইতে অভ্যাস করে নিলেন। যেখানে মহারাণা নিজে কষ্ট সইতে পারেন, সমস্তটা দেশ যেখানে কষ্ট সইতে পারে, সেখানে আমি নরম মাটির দেশে, গঙ্গার গা-জুড়ানো বাতাসে মানুষ হয়েছি বলেই সেখানকার আয়েস আমদানী করতে চাইলে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব কেন?

এই শিক্ষাই প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবের ইতিহাসে প্রথম পাঠ। সবার সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে নিজের হক দখল করতে হবে। সেই শিক্ষার সঙ্গে বইয়ের আর বুদ্ধির শিক্ষা মিলিয়ে প্রভাস চ্যাটার্জি মশায় উদয়পুরের মিনিস্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন। তাঁরই বাড়িতে আজ বিয়ের উৎসবে মেবারী গণ্যমান্য সবাই নেমন্তন্নে চলেছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আর সম্মানে নিজের বুকটিও ভরে উঠল।

প্রবাসী বাঙ্গালী থেকে প্রবাসী রাজপুতের কথা এসে গেল। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারকে ও'রা প্রবাসী রাজপুত বলে মানতে রাজী নন। কারণ, ও'রা

অপঘাত মৃত্যু, পরে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিয়ে, জাহাঙ্গীরের উপর অসীম প্রভাব, সব কথাই বড় প্রেমসে তাঁরা লিখেছেন। কাজেই সত্য ঘটনা হলে মেহেরকে পাবার জন্য শের আফগানকে খুন করানোর কথাটা লিখবার লোভ যে তাঁরা সামলাতে পারতেন, তা মনে হয় না।

আসল কথা হচ্ছে যে, হকিন্স্, সার টমাস রো, এডোয়ার্ড টেরী এঁরা জাহাঙ্গীরের দরবারে এত অবাধে আসা-যাওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন যে, এমন একটা মুখরোচক ব্যাপার তাঁদের অজানা থাকতে পারত না। উইলিয়াম ফিঞ্চ, পিয়েত্রো ডেলা ভাল্লে এ দু'জনও ওই সময় এদেশে ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলেতে লেখা ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠিতে মোগল দরবারের অনেক মজাদার ঘটনার বর্ণনা আছে। কেন থাকবে না শুধু মেহেরকে পাবার মতলবে শের আফগানকে হত্যা করার কথাটা?

যাই হোক, শেষকালে মহম্মদ সাদিক তাব্রেজী, কাফি খাঁ এঁরা দারুণ রঙ-চঙ দিয়ে এই রোম্যান্সটাকে সাজিয়েছিলেন। এ সব থেকে নূরজাহানের জাহাঙ্গীরের উপর যে কি অসীম প্রভাব ছিল তা খুব ভাল করেই প্রমাণ হয়। যে রাজপুত মোগল দরবারে থেকেই এ হেন নূরজাহানের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহবৎ খাঁ।

আমি কিন্তু রাজোয়ারাতে এসে রাজপুত চারণদের কবিতাতে এই প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে কি পাওয়া যায়, তার দিকেই নজর দিলাম।

মরুভূমির মাঝখানে পালাধি নামে একটি ছোট জায়গীরে চারণদের খ্যাতা অর্থাৎ কবিতাতে এই কাহিনী পাওয়া যায়। বাল্যপ্রেম থেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হওয়ার যে রসাল কাহিনী আমরা জানি, তার মোটামুটি সবটাই এতে আছে। মায় নূরজাহানের যুবরাজ খুরমের উপর নেক নজর পর্যন্ত। কবি সুরযমলের 'বংশভাস্কর' বইয়েতেও নূরজাহানের কাহিনী আছে।

যদি আপনারা তেড়ে শুধোন যে, এ-সব কবিতার কতখানি সত্যি, আমি শুধু করজোড়ে নিবেদন করব যে, আমি ইতিহাসের পাণ্ডাও নই, পণ্ডিতও নই। আমার অত শত বিচারে কাজ কি বলুন ত'? আমি শুধু মোগলের কাহিনী রাজপুতের লেখা কবিতায় খুঁজে পেয়েছি বলেই খুশী হয়ে আছি।

বাকী দায়িত্ব ঐতিহাসিকের।

মোট কথা, দেখা গেল যে, ততদিনে মেহেরের বাবা দরবারে খুব বড় ওমরাহ হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। ভাই-ও নেহাৎ কেউ-কেটা ব্যক্তি নয়। তবু

শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহেরকে দেখা গেল জাহাঙ্গীরের হারেমে। সেখানে তিনি ছুঁচের কাজ করে, তুলি দিয়ে রঙীন নক্শা এঁকে কোন রকমে নিজের খরচা চালান। বাদশার সঙ্গে কোন ভাব বা দেখা সাক্ষাৎ নেই পুরোপুরি চারটি বছর ধরে। কেউ কারো খবরও করেন না কখনো। কেমনতরো প্রেম হল এটা?

তা বুঝতে পারা গেল বসন্তকালে। নওরোজের সময় সবাই যখন ফুর্তিতে মেতে উঠেছে তখনো মেহের সাদাসিধে কাপড় পরে বাঁদীদের মাঝখানে বসে কাজ করছেন। বাদশা দেখে থমকিয়ে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে গেলেন।

শুধোলেন,—মেয়েদের মধ্যে যে সূর্য, সেই মেহের আর বাঁদীদের মধ্যে এ রকম তফাৎ কেন?

চার দিকে জমকালো পোশাক পরে বাঁদীরা দাঁড়িয়ে আছে। রঙীন বিজলী বাতিগুলির মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে আটপৌরে সাদা-কাপড়ে-ঢাকা সূর্য বুকে হাত রেখে জবাব দিল,—বাঁদীরা যাদের সেবা করে তাদেরই মর্জি মাফিক থাকে। এরা আমার বাঁদী। তাই আমার ক্ষমতায় যতদূর কুলোয় আমি ওদের সাজাই-গোছাই। কিন্তু শাহানশাহ্, আমি নিজে যার বাঁদী তার খুশি মতই ত' আমায় থাকতে হবে। নিজের খেয়াল অনুসারে নয়।

এই কথাবার্তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে লাভ কি? শুধু এটুকু আমি বলব যে, মেহেরের এই উত্তরের আন্তরিকতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তারই রচনা-করা কবিতা—যা লাহোরে তার কবরের উপর আছেঃ—

দীন আমি। জ্বালায়ো না মোর সমাধিতে
কোন দীপ, পতঙ্গেরে পুড়াইয়া দিতে;
দিয়ো না কুসুম মোর কবর উপরে
পাছে বুলবুল আসি' সুখে গান করে।

রূপসী মেহের শুধু শিল্পী নন, কবিও বটে। এবং খুব উঁচু দরের রোম্যাণ্টিক কবি ছিলেন। মাখফি অর্থাৎ অপ্রকাশ বা পর্দানসীন এই ছদ্মনামে তিনি দিওয়ান-ই-মাখফি (পর্দানসীনের গীতি কবিতা) লিখেছিলেন। (অবশ্য মাখফি এই ছদ্মনামে আরো কয়েকজন মোগল রাজকন্যার কবিতাও পাওয়া গেছে)। আর একজন ছদ্মনামা লোক, ঐতিহাসিক কাফি খাঁর মুন্তাখাব-উল-লুবাব বইয়েও নুরজাহানের কয়েকটি কবিতা তুলে দেওয়া আছে।

মেহের বাদশাহের কাছে বিচার চাইলেন—

তুরা নেহ্ তাকমে লাল্ অস্ত বরকবাই হরির
সুদা অস্ত্ কতরে খুন মিন্নতে গরে বাঁ গির
দিল বাসুরৎ নেদেহম্ তা সুদাহ্ শিরৎ মালুম
বন্দে ইস্কম্ ওয়ে হপ্তা দো দো মিল্লৎ মালুম

ফারসীতে লেখা এই মনগলানো কবিতা বাংলা অনুবাদে এই রকম দাঁড়াবে ঃ—

তোমার রেশমী জামার বোতামে দেখিনু যে লাল মণি,
পীড়িতের খুন চাহিছে বিচার এই আমি মনে গণি;
আমি যে তোমারে দিয়েছি হৃদয়,—
সে শুধু তোমার মুখ হেরি' নয়
আমি যে প্রেমের পূজারী—যদিও শত নীতিকথা জানি।

শুধু এই নয়। তারপরে তিনি কি বলেছিলেন বা ভেবেছিলেন, তাও মেহের কবিতায় লিখে গিয়েছেন ঃ—

শেষের সে দিনে মোল্লারা ভয় করে;
দিয়ো নাক' ভয় আমার এ অন্তরে
বিরহের দায়
তোমা হ'তে হায়—
কাটায়েছি কাল সে ভয়ের ভিতরে।

মনের মানুষটি একবার দেখার পরেই জীবনের মনিব হয়ে দেখা দিলেন।

এত প্রতাপ আর কোন রাজমহিষীর কখনো হয়নি। ইতিহাসে এর তুলনা নেই।

নূরজাহান যে শুধু জাহাঙ্গীরকে জয় করলেন তা নয়। সব ওমরাহরা রইলেন তাঁর পায়ের তলায়। মুখের কথাটি, চোখেব ইশারাটির অপেক্ষায়। জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের প্রতি ছেলেবেলায় ভালবাসার কথা বা তাকে যেমন করেই হোক পাবার জন্য শের আফগানকে খুন করানর কথা কোন সমসাময়িক বইয়ে লেখেনি। সে কাহিনী তাদের দু'পুরুষ পরে প্রথম লেখা হয়ে ইতিহাসের মধ্যে পর্যন্ত লতায় পাতায় বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা ঠিক যে, নূরজাহানের প্রতাপের কোন তুলনা ছিল না। নিজের ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় রাখবার জন্য যখন যাকে খুশি, যখন খুশি নামিয়েছেন আর উঠিয়েছেন। সৎছেলে আর ভাইঝি-জামাই আর সব চেয়ে উপযুক্ত শাহজাদা ছিলেন খুরম

(শাজাহান)—। সুবিধা হবে বলে তার সংগেও একটি গোপন মিষ্টি সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন। সে কথা ইংরেজ রাজদূত সার টমাস রো লিখে গেছেন। শাজাহান নাকি "তাঁর পিতার নারীমন্ডলীর মধ্যে হৃদয় হারিয়েছিলেন। নূরমহল (তখনো তিনি নূরজাহান আর রাণী বেগম এই নামগুলি পাননি) ইংরেজী ফ্যাসানের ঘোড়ার গাড়িতে শাজাহানের সংগে দেখা করে বিদায় দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন মুক্তো হীরে মণিতে ভরা একটা পোশাক, আর বদলে নিয়েছিলেন অন্য সব কাজ থেকে সরিয়ে তাঁর মন।"

তাই তার পরের দিন শাজাহানের দৃঢ় মুখটি হয়েছিল বড় চঞ্চল। ইংরেজ রাজদূত সে মুখে দেখলেন অনেক না-বলা কাহিনী, অসহ বেদনা। হৃদয় আমার হারালো, হারালো।

আর জাহাংগীরের?

তিনি কি শুধু নূরজাহানের রাজ্য চালাবার আর লোক খাটাবার বুদ্ধি বেশী আছে বলেই তাঁর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তাঁকে একেশ্বরী করে দিয়েছিলেন?

না। তা নয়। তাঁকে যে কতখানি ভালবাসতেন, সব বিলিয়ে দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে চমৎকার একটা গল্প আছে। নূরজাহান রাণী হয়েই তাঁর সতীন সুরাসুন্দরীর হাত থেকে জাহাংগীরকে বাঁচাতে চাইলেন। বাদশা রাজী; এই শুধু ন' পেয়ালাতেই রাজী—যদি রাণী বেগম নিজের হাতে সেগুলি হাতে তুলে দেন। রাণী বেগম অবশ্যই রাজী হলেন আর মদ ভোলাবার জন্য গান-বাজনার বন্দোবস্ত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে কি শানায়?

মুর্গী-মুসল্লমের বদলে গাছপাঁঠার তরকারীতে কি চলে? আছেন আপনি রাজী—পাতে সাজান ইলিশ মাছের পাতুরী ছেড়ে দিয়ে কুচো চিংড়ীর চচ্চড়ি দিয়েই ভাতটুকু সাবড়ে নিতে?

কিন্তু রাণী বেগম ন' পেয়ালার বেশী এক পেয়ালাও দেবেন না। যতই কাকুতি মিনতি, জেদাজেদিই করুন না কেন বাদশা। শেষ পর্যন্ত চটেমটে নূরজাহানের হাত পাকড়িয়ে তিনি খামচাখামচি শুরু করে দিলেন। পাল্টা জবাব দিলেন রাণী কিল ঘুষি চালিয়ে। খাস কামরায় এমনতরো হল্লা শুনে বাজনাদাররা শুরু করে দিল কান্নাকাটি, ছুড়তে লাগল হাত-পা আর ছিঁড়তে আরম্ভ করল নিজেদের চুল, কাপড় চোপড়। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাদশা আর তার বেগম

ব্যাপার দেখবার জন্য। ওরা বুদ্ধি করেই এমন কাণ্ডকারখানা লাগিয়ে দিয়েছিল। এ ছাড়া যে স্বামি স্ত্রীর মারামারি থামাবার আর কোন উপায়ই ছিল না।

মারামারি ত' থামল, কিন্তু রাণীর মান ভাঙ্গবে কিসে? গোসাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রইলেন শুয়ে। মুখদর্শন পর্যন্ত করবেন না বাদশার, যদি না তিনি রাণীর পা ছুঁয়ে মাপ চান।

তোবা তোবা! 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।' তাঁকে ছুঁতে হবে একজন মানুষের পা! হোক না তা পৃথিবী আলো করা চরণ-কমল?

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মঝু গাত।

কিন্তু নূরজাহানই বা কম কিসে? রইলেন তিনি গোসাঘরে ঘুষে। থাকো তুমি বাদশা, তোমার বাদশাহী নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত জটিলা কুটিলার দলই বুদ্ধি বাংলাল। অভিমানের সাপও মরবে অথচ সম্মানের লাঠিও ভাঙ্গবে না। জাহাঙ্গীর যদি ওপরে ঝুলবারান্দায় এসে দাড়ান তাঁর ছায়া এসে পড়বে নীচের বাগানে। নূরজাহান যদিও নীচে এসে দাঁড়াবেন তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়বে ওই ছায়া। ভুলিয়ে ভালিয়ে রাণীকে আনা হল বাগানে। জাহাঙ্গীর নিজের ছায়া তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে দিয়ে বললেন—দেখ, দেখ, আমার হিয়া তোমার পায়ের তলায় এসে লুটোচ্ছে।

এমন যে নূরজাহান—যিনি সবাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন তিনিও একজন রাজপুত বীরকে বাগে আনতে পারলেন না। মুসলমান হয়ে মহব্বৎ নাম নিলে কি হবে, মেবারের মহারাণার সৈন্যদের লড়াইয়ে লণ্ডভণ্ড করে পাহাড়ে জঙ্গলে ভাগিয়ে দিলে কি হবে, রাজপুত ত' বটে! তাই মোগল-দরবারেও তাঁর মাথা নোয়ান নি কখনো। এমন কি নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য বাদশার কাছ থেকে যে মামুলী হুকুম নিতে হত তা পর্যন্ত নেননি। রাগে হিংসায় জ্বলছিল সব ওমরাহরা। এখন একটা অজুহাত পেয়ে তারা নির্দোষ জামাই বেচারাকেই হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে সবার সামনে বেদম পেটাল আর কয়েদে পুরে রাখল। মহবতের দেওয়া সব যৌতুক গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। তুই দোষ না করে থাকিস, তোর শ্বশুর করেছে।

নূরজাহানের নিজের ভাই, সবার সেরা ওমরাহ আসফ খাঁ ছিলেন এই দলের সর্দার।

কিন্তু তাতে কি ভড়কিয়ে গেলেন রাজপুত মহবৎ খাঁ? তা কি সম্ভব? মহীপৎ সিংহের কেশর কি বেড়ালের ল্যাজের মত গুটিয়ে আসবে ব্যাপার সংগীন হয়ে উঠেছে দেখে?

কভি নেহি। জান কবুল, তবু মান যাবে না।

কাশ্মীর ফেরত জাহাংগীর চলেছেন কাবুলে। প্রায় সব সৈন্য, আমীর ওমরাহ, ধনরত্ন ঝিলম পার হয়ে গেছে। বাকী শুধু বাদশার নিজের পরিবার স্বজন আর কিছু চাকর বাকর। এমন সময়ে ভোর বেলা মহবতের দু' হাজার রাজপুত ঘোড়সোয়ার নদীর পুল বন্ধ করে দাঁড়াল। দরবারের ঐতিহাসিক মোতামেদ খান ইকবাল-নামা বইয়ে লিখেছেন যে, এমন চুপিসারে কাজ হাসিল হয়ে গেল যে, হামামে বসে বাদশা টেরও পেলেন না যে কি ঘটে গেল। খোজাদের কাছে খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, দুয়ারে প্রস্তুত পালকী। আর জোড় হাত করে সামনে দাঁড়িয়ে মহবৎ খাঁ হুজুরে আর্জি পেশ করছেন যে, আসফ খাঁ প্রভৃতিরা তাকে নেহাৎই বেইজ্জত করে মেরে ফেলবে এই ভয়ে বান্দার বান্দা মহবৎ সাহস করে শাহানশার পায়ের তলায় নিজেকে এনে হাজির করেছে। গোস্তাকি মাপ না হলে জাঁহাপনা তার গর্দান নিতে পারেন।

শুধু তাই নয়। মহবৎ আরো নিবেদন করলেন যে, তার পরে ঘোড়ায় চড়ে জাঁহাপনাকে বাইরে খেলতে যেতে হবে মহবতের সংগে। যাতে সবাই বুঝতে পারে যে এমন বেয়াদবি কাজ শুধু বাদশার হুকুমেই করা হয়েছে। তিনি নিজেই এই সব বেইমান নেমকহারাম আসফ খান কোম্পানীর হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখতে চান।

বে-কায়দায় পড়ে জাহাংগীর শিকারে যাবার পোশাক পরবার জন্য তাঁবুতে যেতে চাইলেন। একবার নুরজাহানের সংগে কথা কওয়াও ত' দরকার। কিন্তু মহবৎ তাতে রাজী হলেন না। কি আর করা যায়?

পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

এদিকে সেই ডামাডোলের মধ্যেই ছদ্মবেশে নুরজাহান উধাও হয়ে গেলেন নদীর ওপারে, যেখানে সবাই জমা হয়ে আছে। তাদের জড়ো করলেন লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু পুলটা যে রাজপুতদের দখলে। আর বাদশাও রাজপুতদের কবলে।

মহবৎ শুধু বেপরোয়া বীর নন। তিনি একাধারে চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্ত দুই-ই। তাই দেখাতে চান যে, বাদশা নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তার

আশ্রয়ে এসে উঠেছেন। ঠিক যেমন ভাবে এককালে ব্রিটিশরা দেখাতে চাইত যে, তাদের আশ্রয়ে স্বাধীনতাটুকু বাঁচাবার জন্যই কালা আদমীরা যেচে এসে তাদের অধীন হয়ে থাকতে চাইছে। লড়াই হলে সে ভোল ত' বজায় থাকে না। কাজেই জাহাঙ্গীরের হাতের মোহর-মারা আঙটি ওপারে পাঠান হল লড়াই না করবার জন্য। এদিকে পুলটাও রাজপুতরা পুড়িয়ে শেষ করে ছিল।

লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে মোগলদের। ওরা ভোরবেলা নদী পার হয়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। সবার সামনে রাণী বেগম নূরজাহান—হাতীর পিঠে বসে, কোলে তার পেয়ারের নাতনী। সে লড়াইয়ে মহবতের কৌশলে আর সাহসে রাজপুতরা মোগলদের পদ পদে হারিযে হঠিয়ে দিল। ভয়ে যখন মোগলের হাতী রণসাজে গভীর জলে ভাসতে শুরু করল, তখন রাজপুতের ঘোড়া জলে তল পাচ্ছে না দেখে তরোয়াল হাতে রাজপুতরা সাঁতরে তেড়ে গেল। নূরজাহানের নাতনীর হাতে এসে বিঁধল রাজপুতের তীর। কিন্তু তিনি নিজে ঘাবড়ালেন না একটুও। বসে রইলেন বিনা আয়াসে—যেন দিল্লীর গোলাপবাগে জলের ফোয়ারার পাশে বসে দিলরুবা বাজাচ্ছেন।

হেরে প্রাণ নিয়ে পালালেন আসফ খাঁ আর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। রাজপুত তাকে প্রাণে মারল না। কিন্তু নূরজাহান যাবেন কোথায়? নিজে যেচে এসে বন্দী হয়ে রইলেন মহবতের আওতায়।

একদিন জাহাঙ্গীরকে বিজয়ী সেনাপতি কিছু বর প্রার্থনা করতে অনুমতি দিলেন। সেদিন বন্দী সম্রাটের প্রতি এই বিশেষ নেক নজরের কারণ ছিল যে, তিনি নূরজাহানকে সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্রীর পদ থেকে চ্যুত করবেন বলে ঠিক ছিল। সম্রাট ওমর খৈয়ামের কবিতার মত একটি প্রার্থনা জানালেন—

'দাও আমায় সরাব আর সুলতানা।'

বুদ্ধিমান রাজপুত সেনাপতি দুটিই জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে দূরে রাখলেন।

সরাব—কারণ ইসলামে মদ বারণ।

সুলতানা—কারণ নূরজাহান মদের চেয়ে অনেক বেশি মাতাল করা নেশা। এবং তার উপর ক্ষুরের চেয়ে বেশি ধারালো বুদ্ধি তাঁর।

মহবৎ খাঁ ভোলেন নি যে, নূরজাহান শুধু যে হাতে-কলমে সাম্রাজ্য চালাতেন ও জাহাঙ্গীর নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন তা নয়, জাহাঙ্গীরের সময়ের মোহরে লেখা থাকত 'বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুম—রাণী বেগম নূরজাহানের

নামের ছাপ পেয়ে সোনার জৌলুষ একশ' গুণ বেড়ে গিয়েছে।' মহবৎ খাঁ ভোলেন নি যে, জাহাংগীর বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, নূরজাহানই সাম্রাজ্যের একেশ্বরী; তিনি নিজে শুধু 'এক সের মদ ও আধ সের মাংস' ছাড়া আর কিছু চান না। (ইকবালনামা-ই-জাহাংগীরী)।

সমস্তটা দেশ এখন মহবতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। নামে বাদশা রইলেন জাহাংগীর, কিন্তু কলকাঠি নাড়েন মহবৎ। তিনি ভাবলেন, দেশকে বুঝতে দিতে হবে যে, সবই ঠিক মত আগেকার মতই চলছে। তাই কাবুল যাত্রাটা আবার শুরু হল।

এবার আরম্ভ হল খেলা চতুরে চতুরে। মহবৎ নালিশ করলেন যে, রাজ্যে সুশাসন হচ্ছিল না ঠিক মত। একজন মেয়েলোকের নামে আর হুকুমে রাজ্য চালান—সেটাও বড় খারাপ দেখায়। কিন্তু বান্দা নিজে সত্যি সত্যিই বান্দা। বিশ্বাস না হয়, জাঁহাপনা, এই তুলে দিলাম আমার খোলা তরোয়াল আর এই পেতে দিলাম আমার খালি মাথা।

ছি ছি! তামাম হিন্দুস্থানের শাহানশাহ কি এমন ভুল কখনো করতে পারেন? লোক তিনি চেনেন খুব ভাল করেই। হাত ধরে তুলে নিলেন হাঁটু-গেড়ে-বসা মহবৎকে। অভয় দিলেন পুরোপুরি। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এত সদুপদেশ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। নূরজাহানকে নিজের সংগে একসংগে নজরবন্দী হয়ে থাকার জন্য হুকুম দিয়ে নিজের ভালমানুষীর আরও হাতে হাতে প্রমাণ দিলেন।

খুশী হয়ে মহবৎ দিলেন প্রকাণ্ড এক ভোজ। তিনদিন ধরে চলল ফুর্তি হৈ-হল্লা। সব আমীর-ওমরাহরা দেখে গেল মহবতের প্রতাপ, বাদশার সংগে খাতির। রাণী বেগম নিজের হাতে তাকে দিলেন অনেক খেলাত। ঘোষণা করলেন সবার সামনে যে, দুনিয়াতে মহবতের মত এত পেয়ারের আর বিশ্বাসী ওমরাহ কেউ নেই। হয় নি, আর হতে পারেও না। সম্ভবত হওয়া উচিতও হবে না!

সেই দুর্দান্ত ঠাণ্ডা কাবুলে এসে রাজপুতদের মাথা হয়ে উঠল দুরন্ত গরম। মনে মনে মোগল আফগানরা এমনিতেই রাজপুতদের উপর চটে ছিল। এখন আবার তাদের খারাপ ব্যবহারের জন্য নালিশ করতে গেলে যেতে হয় মহবতের দুয়ারে। এ যে একেবারে অসহ্য ব্যাপার!

এ দিকে জাহাংগীর সময় পেলেই ইনিয়ে বিনিয়ে মহবৎকে বলতেন যে,

নূরজাহানের আর তার ভাই বেরাদরদের দাপট নিজের কখনো সহ্য হত না। এমন একটা দুরবস্থা থেকে মহবৎ তাকে বাঁচিয়েছেন। শুধু তাই নয়। মহবৎকেই তিনি বিশ্বাস করেন পুরোপুরি। আর কাউকে নয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

না হয়ে উপায় কি? জাহাঙ্গীর যে একদিন নিজে হাতেই ফরমান সই করে দিলেন যে রাণী বেগমের গর্দান নেওয়া হোক। কারণ, রাণী বেগম গোপনে গোপনে মহবৎকে দেখতে পারেন না আর খালি ষড়যন্ত্র করে বেড়ান। মহবৎ সেই ফরমান নিয়ে হাজির হলেন নূরজাহানের কাছে।

রাণী বেগমের প্রাণদন্ড? রাণী বিশ্বাস করলেন। অবশ্য মোগল রাজত্বে সবই সম্ভব। তিনি মরতে তৈরী আছেন। তবে একবার স্বামীকে শেষ দেখা দেখে যাবেন। যে হাতে অনেক কিছু তিনি পেয়েছেন সে হাতে শেষ একটি চুমু দিয়ে যাবেন।

মহাবীর মহবৎ ত' এতে আপত্তি করতে পারেন না? স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসে রয়ে গেলেন পাকাপাকি ভাবে। মৃত্যু পরোয়ানার কথা সবাই ভুলে গেল। তরোয়ালের ধাঁধান খেলা দেখা অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ল না যে মাকড়সার জাল তার নিজেরই চার দিকে বোনা হচ্ছে।

তবু মাঝে মাঝে জাহাঙ্গীর মহবৎকে সাবধান করে দিতে লাগলেন যে, নূরজাহানকে বিশ্বাস করা যায় না। আর আসফ খানের বেটার (ভবিষ্যতে শায়েস্তা খান্) বৌ ত' একটা খুন-খারাপিরই চেষ্টা করছে।

মহবতের তাঁবে মহা সুখে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে কাটাতে জাহাঙ্গীর প্রায় রোজই শিকারে যেতে লাগলেন। যেতে লাগলেন পীরদের কাছে, দরগা মসজিদে। রাজপুত পাহারাদাররা সঙ্গে যায়। তাতে আর কি হয়েছে?

এদিকে আফগানরা বড় শয়তান আর হিন্দু রাজপুতদের দু'চোখে দেখতে পারে না বলে বাদশার মোগল সৈন্য আরও বাড়াতে হল। অথচ বাদশার চার দিকে বেশী সৈন্য পাহারাদার থাকলে লোকে পাঁচটা মন্দ কথা বলতে পারে। কাজেই রাজপুতের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিতে হল। তা ছাড়া এদিকে-সেদিকে নূরজাহানের চররা আরও ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিছক দেশ দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই অবশ্য। কাবুল কান্দাহার মুলতান এ সব অতি সুন্দর জায়গা।

কাবুল থেকে ফেরার পথে একদিন বাদশার খেয়াল হল ঘোড়সোয়ার সৈন্যদের দেখবেন। কিছু না, শুধু যত দূর লাইন চলে সার দিয়ে দু' লাইনে

তারা দাঁড়াবে আর বাদশা তাদের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবেন। খবর পাঠালেন মহবৎকে যে, তার নিজের আসার দরকার নেই। তার সুশাসনে যেখানে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই সেনাপতির সব সময় বাদশার কাছে থাকার দরকার হয় না। তা ছাড়া পুরোনো সৈন্য আর নতুন সৈন্যরা এক সংগে লাইন বেঁধে দাঁড়ালে ঝগড়াঝাটি, এমন কি খুনখারাবিও হতে পারে। কাজেই শুধু নতুন সৈন্যদেরই আজ দেখতে যাবেন বাদশা। মহবৎ খাঁ ততক্ষণে তাঁবু গুটিয়ে সে দিনকার মার্চটা শুরু করে দিতে পারেন।

তাই করলেন মহবৎ খাঁ। এ দিকে জাহাংগীর নতুন সৈন্যদের লাইনের মাঝখানে পেঁছান মাত্রই তারা ওর চার দিকে ঘিরে দাঁড়াল। রাজপুতেরা হতভম্ব হয়ে আলাদা পড়ে রইল।

পাশার দানে মহবৎ হেরে গেলেন। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। তাকে নুরজাহান দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী সৎছেলে শাহজাদা খুরমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। কিন্তু রাজপুতের ছেলে মহবৎ রাজপুত মায়ের ছেলে খুরমের সংগে যোগ দিয়ে আবার দিল্লীর উপর ক্ষমতা খাটাবার পথ করে নিলেন। শেষ পর্যন্ত খুরম বাদশা শাজাহান হয়ে বসলেন এবং মহবৎ খাঁ আজমীরে তার প্রতিনিধি আর সবচেয়ে বড় সেনাপতি হয়ে রইলেন।

আজকের দিনেও রাজপুতেরা মহবৎ খানের স্মৃতিকে প্রবাসী রাজপুত বীরের স্মৃতি বলে পুজা করে। হোন্ না তিনি ধর্মে মুসলমান, বীরধর্মে তিনি রাজপুত। তাই প্রভুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মারেন নি, শত্রুকে কবলে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। লড়তে গিয়েছেন প্রভুর আদেশে কাবুল পর্যন্ত, মরতে ফিরে এসেছেন রাজস্থানেই। বিপদে যখন সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন আশ্রয় নিয়েছেন মেবারের পাহাড়ে, হাতে হাত মিলিয়েছেন মেবারে শরণ-পাওয়া শাহজাদা খুরমের সংগে। সত্যিই বীরত্বের জাঁকজমকে ভরা মোগল দরবারেও মহবতের মত এমন রূপকথার সেনাপতি আর পাওয়া যায় না। শুধু বীরত্বে নয়, মহত্ত্বেও।

যার কাছে বুদ্ধির লড়াইয়ে তিনি হেরে গিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের একেশ্বর কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন, সেই নুরজাহানের পতনের দিনে তাঁর কোন অনিষ্টের চেষ্টা করেন নি। স্বামীর মৃত্যুতে নুরজাহানের জগতের আলো যেন হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিবে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তার জন্য দুঃখ করল না কেউ, ফেলল না একটা দীর্ঘশ্বাস। অস্তগামী সূর্যের পুজা করা ত' সংসারের নিয়ম নয়।

কবি হসরৎ শেরোয়াণী বড় দুঃখে তাঁর কবরের উপর কবিতা লিখেছিলেন,—

জিসকি পাবোসি কি করতে আর্জু গুল হায়তার
খুশক্ কাঁটো কা পড়া হ্যায় ধের উসকি গোর পর।
শেজ পর ফুলো কি শোতি থি কভি কভি যো নাজনী।
হায় উশকি কবর পর এক পঙখড়ী তক ভি নহী॥

বিকচ কুসুমও স্পর্শ করিতে পারেনি যাহার চরণে
সে পরী-কবরে কণ্টকরাশি ঘেরিয়াছে আজ মরণে।
যে রাজকন্যা-শয়ন রচিত শুধু গোলাপের শয্যা
তার সমাধিতে শুষ্ক পত্র নাহি আজ এ কি লজ্জা॥

মনে পড়ল সে কথা। ভাবলাম যে, সেই ক্ষমাহীন শত্রুতার যুগে, শোধ-প্রতিশোধের যুগে মহবৎ খাঁ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েও কেমন পরম উদাসীন রইলেন নূরজাহানের প্রতি।

মেবারী বন্ধুরা উল্লাস করে বললেন মহবতের কাহিনী। তারিফ করলেন তার বুদ্ধির, বাহাদুরীর, বীরত্বের। একজন প্রবাসী রাজপুত বিধর্মী শত্রুর দরবারে কত প্রভাব খাটিয়ে গিয়েছিলেন। বলতে বলতে ওদের বুক ভরে উঠল, মন খুশী হয়ে গেল।

আমারও তাই। রাজপুত চারণরা মহবতের কথা অনর্থক এত বড় করে গাননি। তিনি এত বড় বীর ছিলেন যে, রাজপুত না হয়ে যান না—এই বোধ হয় ছিল চারণদের মনের কথা। তাই তাঁরা ওকে মহারাণা প্রতাপের ভাই সাগর সিংহের ছেলে মহীপৎ বানিয়ে ছেড়েছিলেন। টডও সেই কাহিনীই তার বইয়ে লিখেছেন। অন্য পক্ষে মাসির-উল-উমরা নামে মোগল দরবারের ওমরাহদের সম্বন্ধে যে প্রামাণিক জীবনীর বই আছে তাতে লেখে যে, মহবৎ খান হচ্ছেন ইরাণের শিরাজ শহরের লোক। আসল নাম তার ছিল জামানা বেগ। রাজপুতদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল শুধু রাজপুত সৈন্য নিয়ে লড়াই করার মধ্যে দিয়ে।

সে যাই হোক। আমি ত' রাজোয়ারাতে এসে ইতিহাস লিখতে বসিনি। মেবারীদের মত আমারও চোখে মহবৎ রাজপুতই বটে। পুরোপুরি, নির্ভেজাল, নিঃসন্দেহ।

যার বীরত্বে আছে চমক আর জীবনে আছে রোম্যান্স সেই রাজপুত।

॥ ৪ ॥

রাজকন্যাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় তুলে নিয়ে উল্কার মত বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রাজকুমার।

রাক্ষসের দল বড় বড় মুলোর মত দাঁত আর থামের মত হাত নিয়ে 'হাউ মাউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ' করে তেড়ে এল। রাজকন্যা আর রাজপুত্তুরকে ধরতেই হবে। পথে হল ভীষণ যুদ্ধ, কিন্তু ওদের ধরতে পারবে কে?

রাজকন্যার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ; আর তেমনি স্বয়ংবর করে নেওয়া বরের উপর টান! আর রাজপুত্তুর? তাঁর বীরত্বের সামনে যে দাঁড়াতে পারে এ হেন কেউ জন্মায়ই নি। আর তার উপর রাজপুত্তুর করেছেন ধনুক-ভাঙা পণ—রাজকন্যাকে রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করবেনই। কাজেই শত্রুরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

যদি পেরে উঠত, তাহলে ঠাকুরমার ঝুলির গল্পই হত না। শীতের ভর সন্ধ্যেয় ঢুলু ঢুলু চোখে ঠাকুমার লেপের তলায় রেড়ীর তেলের বাতির আঁধারে খোকামণির গল্প শোনাটাই মাটি হত তাহলে। কাজেই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে হবেই। রাজপুত্তুরকে রাক্ষসদের হারাতে হবেই।

এ ত' আর বাংলা সিনেমার গল্প নয় যে, নায়ক নায়িকার মধ্যে অন্তত একজনকে—আর দুজনকে হলেই আরো ভাল—চিতার আগুনে শুতে হবেই। সঙ্গে সঙ্গে তার ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরোবে গলা-ফাটানো সুরে পিলে-চমকানো, থুড়ি, হৃদয়-গলানো গান। যতক্ষণ তা না হচ্ছে গল্প শেষ হতেই পারে না।

কিন্তু ঠাকুমার লেপের তলায় গরমাগরম আরামে এমন ধারা বেয়াড়া উপসংহারে গল্প চলবে না। রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনবে রাজপুত্তুর। রাক্ষসেরা লড়াইয়ে হেরে যাবে আর আকাশ থেকে হবে পুষ্পবৃষ্টি পক্ষীরাজের মাথায়। তবেই না নিশ্চিন্দি আরামে ঠাকুরমার কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়বে খোকামণি।

কিন্তু অন্তত একবার-
আমার গল্প ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।

এমন একটা সুবিধাজনক উপসংহার হল না। নটে গাছটি বিষমাখানো কাঁটা-গাছ হয়ে নতুন করে গজাল। উত্তুরে হাওয়ায় তার কাঁটা সোঁ সোঁ করে ছুটে এসে চার ধারে ছড়িয়ে পড়ল। আর সব জায়গাটা বিষের জ্বালায় জ্বলে গেল। রাজপুত্তুর আর রাজকন্যা দু'জনেই মারা গেল রাক্ষসের হাতে। রাজ্য গেল ছারখারে।

পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী ঠিক সেই রূপকথারই গল্পের মত রোমাঞ্চকর। সেই কাহিনীর মতই শুধু রাক্ষস সৈন্যদের হারিয়ে রাজপুত্তুর রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে বসবাস করতেন, যদি রাজকন্যার বাবা উত্তর থেকে শত্তুরের কাঁটা আমদানী না করতেন। কাজেই "এর পর তারা চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল" এমন একটা আনন্দের পরিণতি তাদের কপালে ঘটল না।

অজয়মেরু অর্থাৎ অজমের শহরের সব চেয়ে বড় বীর ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। সোমেশ্বর চৌহানের রাজধানী ছিল আজমীরে আর অনঙ্গপাল তোমরের ছিল দিল্লীতে। কনৌজে সে সময় রাজা ছিলেন বিজয়পাল। বিজয়পাল দিল্লী আক্রমণ করলে অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের সহায়তা চেয়ে পাঠালেন। দুজনে মিলে সে সময়কার উত্তর-ভারতের সব চেয়ে বড় অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা বিজয়পালের হাত থেকে দিল্লী রক্ষা করলেন।

তার পর পৃথিবীর ইতিহাসে সব সময় যা হয়ে এসেছে তাই হল। অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহের শান্তি হল বিবাহে। অপুত্রক অনঙ্গপালের দুই মেয়ে ছিল। একজনের বিয়ে হল সোমেশ্বরের সঙ্গে আর ছোট জনেরও বিয়ে দেওয়া হল বিজয়পালের সঙ্গে। আগেকার দিনে বিয়ের মন্ত্র না হলে সন্ধির মন্ত্রণা ঠিক মত জমত না।

কাজেই বিজয়পালকে ঠিক মত ঠাণ্ডা করবার জন্য একটি মেয়ে তার হাতে সঁপে দিতে হল।

কাজে কাজেই পৃথ্বীরাজ আর জয়চাঁদ দুই ভায়রা ভাইয়ের ছেলে। সম্পর্কটা যখন এত কাছের, হিংসা-জ্বালা বেশী হতেই হবে। না হলে যে হিন্দুস্থানের হাওয়ার মান থাকে না।

তার উপর জয়চাঁদ বড় রাজ্যটার অধিকারী হলেও পৃথ্বীরাজই ছিলেন অনঙ্গপালের প্রিয়। আবার পৃথ্বীরাজকেই তিনি দিল্লীর রাজপাট দিয়ে গেলেন! এমনিতেই জয়চাঁদের মনে জমা ছিল অনেক অসন্তোষ। এবারে আগুনে পড়ল ঘিয়ের আহুতি।

পূর্বপুরুষের সেই ধারাটা কি আমরা এখনো ছাড়তে পেরেছি? এখনো যে আমরা সব সইতে পারি, পারি না শুধু আত্মীয়-স্বজনের উন্নতি।

জয়চাঁদও পারেন নি! পৃথ্বীরাজের মত সুপুরুষ আর বীরপুরুষ রাজোয়ারাতে নাকি আর কখনো কেহ হননি। তাঁর সারাটা জীবন ছিল বীরত্বের একগাছা জয়মালা। পৃথিবীতে শিভ্যালরী যতদিন থাকবে, পৃথ্বীরাজের নামও থাকবে তত দিন। বীরগাথায় চৌহানদের আসন খুব উঁচু। কিন্তু সবার উপরে সিংহাসন পৃথ্বীরাজের।

চারণদের গানে গানে তাঁর বহু কাহিনী আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাঁর রসিকতা, জীবনকে শিল্পীর মত উপভোগ করা, আর মরণকে বীরের মত বরণ করা চারণদের বহু গানের মাল মশলা যুগিয়েছে। তাঁর সময়কার প্রত্যেক রাজার সভাতেই হত তাঁর গান। প্রতি বীরের মনে ছিল সে জন্য হিংসা। প্রতি রাজকন্যার নয়নে তাঁর স্বপ্ন। ইহলোকে রূপকথার রাজপুত্র যদি কেউ হয়ে থাকেন, তিনি হচ্ছেন পৃথ্বীরাজ।

সেই রূপকথার রাজপুত্রের গলায় স্বয়ংবর-সভায় মালা পরিয়ে দিলেন তাঁর সব চেয়ে বড় শত্রু রাজা জয়চাঁদের মেয়ে সংযুক্তা।

আগুন জ্বলে উঠল সমস্ত উত্তর-ভারতে। জ্বলে উঠল জয়চাঁদের মনে। এমন কি, স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রিত আর সংযুক্তার প্রত্যাখ্যাত সব রাজাদের মনে। সে আগুনের লেলিহান শিখায় ধরা পড়ল সমস্ত দেশের স্বাধীন হিন্দু রাজ্যগুলি। একে একে—রাজোয়ারা থেকে বাংলা পর্যন্ত।

দিল্লী ও আজমীর দুইয়েরই রাজা আর এত নাম-যশের অধিকারী পৃথ্বীরাজের সমৃদ্ধিতে জয়চাঁদের ঈর্ষার অন্ত ছিল না। তাই নিজেকে একচ্ছত্র রাজা বলে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কোন রাজা যদি সে যজ্ঞে এসে হাজির হতে দ্বিধা বোধ করেন, সে দ্বিধাকে দূর করবার জন্য দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল রাজকন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর।

সেই সংযুক্তা, যাঁর রূপের বর্ণনা হচ্ছে যে—

কুটিল কেস সুদেস পৌন পরিচিয়ত পিক সদ।
কমল গন্ধ, বয়-সন্ধ, হংসগতি চলত মন্দ মন্দ॥
সেত বস্ত্র সোহৈ সরীর, নখ স্বাতি-বুন্দ জস।
ভ্রমর ভবহিং ভুল্লহিং সুভাব, মকরন্দ বাস রস॥
নয়ন নিরখি সুখ পায় সুক য়হ সুদিব্য মুরতি রচিয়।
উমাপ্রসাদ হর হেরিয়ত মিলতি রাজ প্রথিরাজ জিয়॥

কুঞ্চিত কেশে সুন্দর মোতির (অর্থান্তরে, ফুলের) মালা গাঁথা রয়েছে দেখা যাচ্ছে; কোকিলের মত মিষ্টি তাঁর স্বর; পদ্মের গন্ধ তাঁর গায়ে। বয়ঃসন্ধি হয়েছে তাঁর। তিনি হংসগতিতে ধীরে ধীরে যাচ্ছেন। শ্বেত বস্ত্র গায়ে শোভা পাচ্ছে। নখ মুক্তার মত চক-চক করছে। ভ্রমর তাঁর অধরামৃতরস ও পদ্মগন্ধের জন্য ভুল করে চার দিকে গুঞ্জরণ করছে। এ রকম রূপের ছটা দেখে শুকপাখী খুব আনন্দিত হল আর ভাবল যে, এমন অলৌকিক রূপসম্পন্ন মূর্তি যখন সৃষ্টি হয়েছে, হরগৌরীর প্রসাদ চাচ্ছি, যেন রাজা পৃথ্বীরাজকে ইনি স্বামীরূপে পান।

হিন্দী ভাষার আদিকবি ও মহাকবি রাজস্থানী চান্দ বরদাইয়র 'পৃথ্বীরাজ রাসো' মহাকাব্যে এ রকম রসাল বর্ণনায় অনেক জায়গাতেই শুক সারী ডাকিনী যোগিনী বা নানা রকম অলৌকিক প্রাণী প্রভৃতির মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছে। রাসো মহাকাব্যে সংস্কৃত ছাড়া আরবী ফারসী কথাও অনেক আছে। আর রাজস্থানী চলিত ভাষার ত' কথাই নেই। প্রাচীন হিন্দী রচনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই চাঁদের লেখনীতে। তিনি জন্মেছিলেন লাহোরে আর মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর বহু আলাপ-পরিচয় ও যাতায়াত ছিল। তিনি পৃথ্বীরাজের সভাকবি অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ ছিলেন। প্রাচীন বাংলা কাব্যের ভাষার মিল ও সাদৃশ্য যে কতখানি তা কাউকে দেখিয়ে দিতে হবে না। শুধু বানানের সামান্য তফাতটুকুর পর্দা তুলে পড়ে দেখলেই বুঝা যাবে। প্রাচীন হিন্দীর জায়গায় দরকার মত স-র বদলে শ, জ-র বদলে য, ন-র বদলে ণ আর ঈ চিহ্নের বদলে হ্রস্বই পড়ে নিলেই কথার মানে বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

শাস্ত্র মত পদ্মিনী নারীর যে সব চিহ্ন থাকবার কথা তার সবই সংযুক্তার (রাসোর ভাষায় সংযোগিতা) ছিল। পৃথ্বীরাজও কম যেতেন না। 'কেমন বীর মুরতি তার, মাধুরী দিয়ে মিশা" রবীন্দ্রনাথের এই কথার সার্থকতা পাওয়া যায় পৃথ্বীরাজের বর্ণনায়।

সংভরি নরেস সোমেসপুত দেবত্ত রূপ অবতার ধৃত।
সামন্ত সুর সব্বৈ অপার ভুজান ভীম জিমি সার ভার॥
জিহি পকরি সাহ সাহাবত্তীন তিহুঁ বের করিয় পানীপ হীন।
সিংগিণি সুসব্দ গুনি চঢ়ি জঞ্জীর চুক্কই ন সবদ বেধংত তীর॥
বলি বৈন করণ জিমি দান পান সত সাহসী সীল হরিচন্দ সমান।
সাহস সুকম্প বিক্রম জু বীর দানব সুমত্ত অবতার ধীর॥

সম্বর দেশের রাজা সোমেশ্বরের পুত্রের দেবতার অবতারের মত রূপ। যেন কোন দেবতা অবতারের রূপ নিয়ে নেমে এসেছেন। তাঁর বীর সামন্তের লেখাজোখা নেই। তাঁর বাহু খুব জোরালো আর লোহার মত ভারী। তিনি তিন বার শাহাবুদ্দিন বাদশাকে শ্রীহীন করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পশুপক্ষীর আওয়াজ শুনেই শব্দভেদী বাণে তাদের বিদ্ধ করতে পারতেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে তিনি বলিরাজার মত ছিলেন, কর্ণের মত ছিলেন দাতা আর শীলতায় ছিলেন সহস্র হরিশ্চন্দ্রের মত। ধীর আর বীরতার মধ্যে সাহস শুভকর্ম ও পরাক্রম এত ছিল যে উন্মত্ত দানবের অবতার বলে মনে হত। চৌদ্দ বিদ্যা ও সব কলা তার জানা ছিল। সাক্ষাৎ কামদেবের অবতার বলে মনে হত।

এই পৃথ্বীরাজ (রাসোর ভাষায় প্রথিরাজ) যিনি

"সহস-কিরণ ঝলহল কমল রতি সমীপবর বিন্দ"

তার সুখ্যাতি শুনে রাজকন্যার সমস্ত অঙ্গে রোমাঞ্চের তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল।

চাঁদ কবির আদি হিন্দী মহাকাব্য পড়তে পড়তে আদি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর ধ্বনি এসে মুরজমন্দ্রে কানে বাজতে লাগল—

সুনন স্রবন প্রথিরাজ জস উমংগ বাল বিধি অংগ।
তন মন চিত চহুঁয়ান পর বস্যো সুতরহ রংগ।

সংযুক্ত তনু, মন ও চিত্ত প্রেমতরঙ্গে চৌহানের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল। কিন্তু চৌহান কোথায়?

তিনি স্বয়ংবর-সভায় এলেন না। তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যে রাজারা আসবেন তাঁদের জয়চাঁদকে রাজচক্রবর্তী বলে মেনে নিতে হবে। দিল্লীর অধীশ্বর বাদশারা পরের যুগে নিজেদের জগদীশ্বর ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতকে তখনো দিল্লীর সে সম্মান হয় নি। অবশ্য মহাভারতের সময় থেকেই ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চলের গুরুত্ব সবাই বুঝতে আরম্ভ

করেছিল। যুধিষ্ঠিরও এ জন্যই এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু তখনো 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' একথা মানবার মত অবস্থা হয় নি।

রাগ করে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে এই রাজসূয় যজ্ঞে একটা ছোট কাজের ভার দিলেন। কাজেই তিনি আসেন কি করে? এদিকে জয়চাঁদ অনুপস্থিত রাজার একটা সোনার মূর্তি তৈরী করে সভার দরজায় দরোয়ানের জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের দরজা পাহারা দিচ্ছিলেন যে মহারাজা তাঁর সোনার মূর্তি পাহারা দিতে লাগল কনৌজের রাজার রাজসূয় যজ্ঞের সভার দরজায়।

রাজকন্যা কাকে দেবেন মালা?

কত স্বয়ংবর সভার কথাই না কাব্যে পাওয়া যায়। দময়ন্তী নলকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু বরণমালা পরাতে এসে দেখলেন, দেবতারা নলের ছদ্মবেশ ধারণ করে বসে আছেন। নিজের বুদ্ধি আর ভালবাসার জোরে তিনি আসল প্রেমিককে খুঁজে বের করলেন। দেবতাদের দল তাকে ঠকাতে পারল না। সীতা বা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে কোন মার-প্যাঁচ ছিল না। কারণ যিনি ধনুর্ভঙ্গ করতে পারবেন তিনিই সীতাকে পাবেন। যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন দ্রৌপদী তাঁকেই দেবেন বরণমালা। কিন্তু সীতা বা দ্রৌপদী কাকেও ত' পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে চোখে না দেখা, এমন কি গরহাজির, প্রিয়কে বরণ করতে হয়নি?

অপেক্ষাকৃত একালের সাধারণ রক্তমাংসের মানবী সংযুক্তাকে সেই বড় কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হল। মন যাকে চায় তাকে পাওয়ার নেই কোন উপায়। না আছেন তিনি উপস্থিত, না পারবেন তিনি উপস্থিত হতে—তাকেই বরণ করা হয়েছে এ খবর পেয়ে। এমন কি তিনি যে স্বয়ংবরা সংযুক্তাকে গ্রহণ করতে চাইবেন কি না তা পর্যন্ত জানা নেই। যদি বা চান, বিপদ ও শত্রুতা ত' কম হবে না তাতে?

একালিনী তরুণীরা বাপ-মায়ের অবাঞ্ছিত জনের প্রেমে পড়ে সেকালের স্বয়ংবর প্রথার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে করে যে, হায়, হঠাৎ যদি কোন মন্ত্রবলে স্বয়ংবর, গন্ধর্ব বিয়ে, এসব সুন্দর সুন্দর প্রাচীন প্রথাগুলি ফিরে আসত, তাহলে কত সমস্যাই না সহজে মিটে যেত।

কিন্তু সে পথেও যে কত বাধা, সে কমলেও যে কত কণ্টক, তা একবার একালিনী প্রেমিকারা বিবেচনা করে দেখুন।

আর প্রেমিকদের দিকটাও ভুললে চলবে না। একালে আইন জিনিসটা অত্যন্ত বেদরদী। তাকে বাঁচিয়ে না চললে যে বিরহ যাপন করতে হবে সরকারী রামগিরিতে, সে কথা হামেসাই মনে করে পা টিপে টিপে প্রেমের পথে এগোতে হয়।

হলপ করে প্রত্যেক সুরসিকা পাঠিকা বলে দেবেন যে, এ রকম অবস্থায় কোন একালিনী অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত প্রেমিকের গলায় মালা দেবার জন্য ব্যাকুল হলেও সাধারণতঃ হাতে-কলমে নিজেকে ধরা দেবেন না। শেলী আর রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে, মেট্রো নিউ এম্পায়ারের পর্দায় নিজের মনের ছবি দেখে সন্ধ্যার পর লেকের পাড়ে নির্জনে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়ে ফেলে বাড়ি ফিরে কোন মতে দুমুঠো খেয়ে নেবেন। বড় জোর পাতে ইলিশ মাছের পাতুরীটা অনাদরে পড়ে থাকতে পারে।

কিন্তু রূপকথার নয়, ইতিহাসের সংযুক্তা খাঁটি রাজপুতানী। সভা-ভর্তি রাজাদের বিস্ময় ও রাজচক্রবর্তী বাপের বিদ্বেষ পুরোপুরি অবহেলা করে তিনি এগিয়ে চললেন। রাজসভার সব উপস্থিত রাজাদের বংশ, রূপ ও গুণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন কবি। সে সব কানে না তুলেই চললেন দুয়ারের দিকে। হয়ত পিতা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হয়ত দুয়ারের কাছে গ্যালারীতে বসা উপরাজা ও সামন্ত রাজারা তাদেরই কারো কপালে, থুড়ি গলায়, মালা এসে পোঁছাবে—এই আশায় মাথা হেলিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু রাজকন্যাকে কেউ বাধা দিতে এলো না। মনেও হয়ত কারো হয়নি বাধা দেবার কথা—এমনি আকস্মিক ব্যাপার একটা হল।

দুয়ার পর্যন্ত এসে সংযুক্তা চৌসর অর্থাৎ জয়মালা দিলেন দারোয়ান ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা পৃথ্বীরাজের স্বর্ণমূর্তির গলায়। এক রামায়ণে সীতার স্বর্ণমূর্তি নিয়ে রামের যজ্ঞ করার কথা আছে। কিন্তু সেখানেও রাম ও সীতার পরস্পরে ছিল প্রেম, ছিল দাম্পত্য সম্বন্ধ, ছিল ধর্মের বন্ধন। কিন্তু সংযুক্তার বেলায় ছিল শুধু পূর্বরাগের বেহিসাবী বেপরোয়া প্রেম। সংসারে যার কোন স্বীকার নেই।

কিন্তু হায়, হৃদয়ের বন্ধন যে সব চেয়ে বড় বন্ধন। মন্ত্র দিয়ে যার হয় না হিসাব, মন্ত্রণা দিয়ে হয় না যাচাই, অথবা আইন বা সমাজ দিয়ে কোন বিচার।

সংযুক্তা বললেন,—দেশ, জাতি ও গুণের বিচারে যে রাজা বরণীয়, তাঁকে আমি এই বরণ করলাম। চৌহানরাজ সোমেশ্বর-পুত্র পৃথ্বীরাজ যার বরনাম, মনে মনে বিচার করে আমি তার গলার গান্ধর্ব মতে জয়মালা দিলাম। তিনি আমায় গ্রহণ করুন।

জয়চাঁদ চটে-মটে লাল। কোন রকমে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন,—বাছা, তুমি ভুল করেছ। আবার রাজাদের মধ্যে ঘুরে এসে নিজের বর বেছে নাও। প্রথমবার স্বয়ংবর ঠিক হয়নি।

আবার ফিরে সমস্ত রাজাদের সম্বোধন করে খুব পরিষ্কারভাবে রাজকন্যা বললেন,—"আপনারা সবাই বিচার করুন। বহু যশ বহু গুণে যিনি শ্রেষ্ঠ, জাতিতে যিনি উত্তম, দেশ, পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যাঁর উৎকৃষ্ট, তাঁর পরম নাম আমি গ্রহণ করলাম। দেবতারা জেনে রাখুন। আমি আবার তাঁর পাশে যাচ্ছি। সবার সম্মুখে তাঁর প্রশস্ত কণ্ঠে আবার মালা দিচ্ছি।"

আপত্তি করে জয়চাঁদ হেঁকে বললেন,—"বৎসে, তোমার ঠিকমত পতি বরণ কবা হল না। আবার তুমি রাজাদের মধ্যে ঘুরে এসে স্বামী বেছে নাও।"

তৃতীয়বার রাজকন্যা সেই স্বর্ণমূর্তির কাছেই ফিরে এলেন।

তৃতীয়বার কবির দল সব উপস্থিত রাজাদের বংশ আর গুণাগুণ একে একে ব্যাখ্যান করে যেতে লাগলেন।

রাজারা সংযুক্তার এই বরমালা পৃথ্বীরাজের গলায় দু' দু'বাব দেওয়াকে খুব হিংসার চোখে দেখেছিলেন। তবু তাঁরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন যে, রাজকন্যার হৃদয়ে পৃথ্বীরাজই খুব গভীব আসন পেয়েছেন। এ দিকে সমস্ত লোকের চোখের সামনে সংযুক্তা চৌহানের সুঠাম কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন বরণমালা আর এমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর স্বর্ণমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন ইন্দ্রাণী শচী ইন্দ্রকে উৎকণ্ঠ হয়ে দেখছেন।

আর জয়চাঁদ? তিনি না বারণ করতে পারলেন, না মেয়ের হাত টেনে আটকাতে পারলেন। রাগে গর-গর করতে করতে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় মুখ নীচু করে অলক্ষিতে গিয়ে অন্তঃপুরে মুখ লুকালেন। ঘোষণা করেছিলেন যে, কন্যা স্বয়ংবরা হবে। সে নিজে বর বেছে নিয়েছে পিতার শত্রুকে, রাজসূয় যজ্ঞসভার দ্বারপালকে। নিজের প্রতিজ্ঞায় রাজা বাঁধা হয়ে আছেন। বাধা দিতে পারেন না; প্রত্যাদেশ করাও সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয়ধর্মে বাধবে। রাঠোর যে ক্ষত্রিয়কুলের চূড়া বলে দাবি করে।

শেষ পর্যন্ত তিনি গঙ্গার তীরে একটা বাড়িতে মেয়েকে নির্বাসনে পাঠালেন। এক হাজার দাসী তাঁকে ঘিরে পাহারা দিতে লাগল। রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে রইলেন।

সবাই জানে যে, এ সংসারে কিং এডোয়ার্ডরাই মিসেস সিম্পসনদের জন্য সমাজ, সম্পদ, রাজপাট ছেড়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড মাথায় তুলে নেন। আমানুল্লারাই রাণীর জন্য রাজত্ব ছেড়ে রাজগীতে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী হয়ে যান। কিন্তু একজন রাজকন্যা যে প্রেমের প্রতিদান পাবেন কি না, তা না জেনেই যে কোন রাজার রাণী হওয়ার আশা ছেড়ে শুধু সম্পদ ত্যাগ নয়, স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে সংবাদ ইতিহাস মনে রাখলেও আমরা মনে রাখি না।

এদিকে পৃথ্বীরাজের কানে খবর পৌঁছানমাত্র তাঁর শিভ্যালরী বোধ জেগে উঠল। তিনি সব সামন্তদের ডাকিয়ে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। কনৌজে গিয়ে স্বয়ংবৃতা বধূকে উদ্ধার করে আনা উচিত হবে কি হবে না, সে বিচার করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ বোধ করলেন একটা ব্যথা। একটা এমন ব্যথা তিনি আগে টের পাননি। এক সাহসিকা তরুণীর নীরব প্রীতি। ঘন বনের অন্ধকারে একটি হঠাৎ-পাওয়া গোলাপের সুরভি আর সৌন্দর্য! মনের মধ্যে অনুভব করলেন—

লগ্গি বান অনুরাগ উর
মনমথ প্রেরি বসন্ত।
সহৈ নৃপতি অষ্মৈ ন কহু
খেদে রিদয় অসন্ত॥

খেদে অর্থাৎ প্রেম-বেদনায় হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠল; কামদেবের পাঠান বসন্তের বাণ অনুরাগ ফুটিয়ে দিল তাতে।

কিন্তু অভিন্নহৃদয় কবি চাঁদ এসে বাধা দিলেন। বললেন যে, এতে মহা অশুভ হবে। রাজা তবুও কনৌজে যেতে চাইলেন। কিন্তু সামন্তরা সবাই এই বিবাদের মধ্যে যাওয়ার বিপক্ষে মত দিয়ে সভা ভঙ্গ করে চলে গেলেন। তারপর রাজা শিকারে গেলেন, শিবমন্দিরে গেলেন, অন্য দিকে মন ফেরাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়! হৃদয় যে মানে না।

শেষ পর্যন্ত রাজা যখন আবার কবিকে নিজের ইচ্ছা জানালেন তখন কবি

বললেন যে, গেলে ছদ্মবেশেই যাওয়া উচিত হবে। কিন্তু পৃথ্বীরাজ বীর। তিনি কি যাবেন চোরের মত? না, বীরের মত? বরণ করে রেখেছেন তাঁকে যে বন্দিনী বধূ, তাঁকে উদ্ধার করে আনতে কি চোরের মত যাওয়া যায়? তিনি চুপ করে রইলেন।

সামন্তরাও তাঁকে বারণ করলেন। দিনের পর দিন যায়। যাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সেই মানা করে।

এদিকে রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে আছেন।

এক বছর পরে আবার বসন্ত ফিরে এল। রাজা আবার কনৌজ যাবার কথা তুললে এবার নূতন রাজমন্ত্রী বললেন যে, ছদ্মবেশ নয়, সময়োচিত বীরবেশেই রাজার কনৌজ যাওয়া ঠিক হবে। এমন ভাবে যেতে হবে যেন সমস্ত সৈন্য সঙ্গে গিয়ে যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয়। একজন অমাত্য অবশ্য বাধা দিয়ে বললেন যে এটা ঠিক হবে না, কারণ, শাহাবুদ্দিন ঘোরী নিকটেই আছে আঘাত হানবার জন্য।

চৈত্র মাসে পৃথ্বীরাজ চললেন সসৈন্যে কনৌজের দিকে।

কনৌজের কাছে এসে তিনি সৈন্যদের পিছনে রেখে শুধু চাঁদ কবিকে সঙ্গে নিয়ে ধনী বিদেশী যুবকের বেশে শহরে পৌঁছালেন। যেখানে সংযুক্তা নজর-বন্দী ছিলেন, সেখানে গিয়ে আত্মপরিচয় দিবার আগেই কিন্তু কনৌজের সৈন্যদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদের তুমুল লড়াই হল।

এদিকে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে জানালা থেকে দেখতে পেলেন। তাঁরও রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল।

সুনি সুন্দরী বর বজ্জন চল্লী।
খিন অলপহ তলয়হ মুখ ঝল্লী॥
দেখি রঞ্জি সংযোগি সু ভল্লী।
ফুলি বাহ মুখ কুমুদহ কল্লী॥

দুজনেই আকুল অবশ-চিত্ত হয়ে গেলেন।

রাজকন্যা জানালা থেকে সরে এসে ছবির ঘরে গিয়ে নীচে দাড়ান ছদ্মবেশীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের ছবি মিলিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে এই সেই—সেই অদেখা অপরিচিত বর যার মূর্তির গলায় তিনি মালা দিয়েছেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখপদ্মের শোভা অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল—

হিয় কম্প বিকম্প বিপখ পথং।   মন্ মন্ত বিরাজত কামরথং॥
কল কম্পিত কম্প কপোল সুভং।   অলকাবলি পানি উচন্ত উচং॥

লজ্জায় পুলকে অরুণবর্ণা রাজকন্যা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে দাসীকে দিয়ে এই বিদেশীকে আরো যাচাই করে নিলেন। তারপর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যে এখনি "গাঁঠ বন্ধন" অর্থাৎ শুভকর্ম সম্পন্ন হয়ে যাক।

সখীরা ভাবল যে, যাদের মধ্যে আগে থেকেই মন-বিনিময়, এমন কি প্রকাশ্যে স্বয়ংবর হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে নূতন করে বিয়ের আর প্রয়োজন কি?

তবু ক্ষত্রিয় আচারে দু'জনে গান্ধর্ব মতে বিয়ে হল। বিয়ের পর রাজা রাজকন্যাকে বললেন, তবে এবার দিল্লী চল। সে প্রস্তাবে ক্ষণমাত্র রাজকন্যার দ্বিধা হল। সেই দ্বিধা যা প্রত্যেক কুমারীর প্রথম বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যাবার আগে হয়। বনবালিকা, আশ্রমপালিতা শকুন্তলার পর্যন্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে যে দ্বিধা হয়েছিল। মন যেতে চায় আর চরণ চলতে চায় না।

এদিকে ভোরবেলা পৃথ্বীরাজের দলের লোকরা এসে খবর দিল যে আর দেরি করলে চলবে না; এখনি সৈন্যদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হবে। না হলে সমূহ বিপদ। পৃথ্বীরাজকে রওনা হতে দেখে সংযুক্তার খুব কষ্ট হল। কিন্তু উপায় কি? বিবাহ-রাত্রির পরই যে আসে কালরাত্রি।

সুখ এঁদের দু'জনের জীবনে খুব অল্প সময়ের জন্যই এসেছিল। দিল্লী ফিরে গিয়ে শাহাবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আগে পর্যন্ত অল্প সময়টুকু এরা যা সুখ ও শান্তিতে সময় কাটাতে পেরেছিলেন, তা চিরকাল নবদম্পতীদের স্বপ্ন হয়ে থাকবে। কবি চাঁদ বলেন যে, সংযুক্তা যেন সমুদ্র আর পৃথ্বীরাজ যেন হংস হয়ে সুখের সপ্তম স্বর্গে বিরাজ করেছিলেন।

এদিকে জয়চাঁদের সৈন্যদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হল। রাত্রিতে চাঁদ কবি যেখানে ছিলেন, সেখানে দুজনে এসে পরদিন ভোরে দিল্লী যাবার জন্য তৈরী হলেন।

কিন্তু রাজা কি বীরত্বের কীর্তিতে মুগ্ধা স্বয়ংবৃতা বধূকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবেন চোরের মত?

ইংরেজীতে বলে "নন বাট দি ব্রেভ ডিজারভস দি ফেয়ার"। সাহসী ছাড়া কেহ সুন্দরী লাভের যোগ্য নয়।

তাই যাত্রার সময় পৃথ্বীরাজ কবি চাঁদকে জয়চাঁদের কাছে পাঠালেন। বলে পাঠালেন যে, এবার আমি তোমার কন্যাকে বিয়ে করেছি আর দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি।

চাঁদ বাধা দিলেন। বললেন,—আশা তোমার পূর্ণ হয়েছে। ঘরে ফিরে চল। শত্রুতা বাড়িয়ে কি হবে?

কিন্তু রাজপুত রাজনীতি বুঝে না।

পৃথ্বীরাজ জোর করে চাঁদ কবিকে পাঠালেন জয়চাঁদের কাছে। বলে পাঠালেন,—আমি চোর নই। সিংহের গহ্বর থেকে সিংহের কন্যাকে নিয়ে চললাম, এই জানিয়ে যাচ্ছি। যার সাহস ও শক্তি থাকে, আমায় বাধা দিতে পার।

কবি এসে জয়চাঁদের সভায় নিবেদন করলে,—দিল্লীশ্বরী মহারাণী সংযুক্তা আপন স্বামীর সঙ্গে নিজের ঘরে যাচ্ছেন এবং আপন পিতার আশীর্বাদের অপেক্ষা করছেন।

আর যায় কোথায়? নিজের মেয়ের স্বয়ংবরে রাজার মনের ব্যথার সীমা ছিল না। তবু সেটাকে অল্পবয়সী মেয়ের ছেলেমানুষী বলে কোন রকমে সহ্য করা যেত। আব এ যে ব্যথাব উপর অপমান! কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা। রেগে রাজা সব সৈন্যসামন্তদের হুকুম দিলেন, যে যেমন করে পার পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তাকে জীবন্ত ধরে আনো। জীবন্তে ওদের আনা চাই।

সংযুক্তাকে ঘোড়ায তুলে নিয়ে পৃথ্বীরাজ বায়ুবেগে নিজের সৈন্যদেব সঙ্গে মিলিত হলেন। কনৌজ থেকে দিল্লীব পথে ঘোর যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে খুব বড় অংশ নিল জযচাঁদেব মুসলমান সৈন্যরা।

মুসলমান? হ্যাঁ। মুসলমান সৈন্য ও মুসলমান মীর অর্থাৎ আমীররা।

মত্ত মীর জম সম সরীর।
জই রুক্যো নৃপ অগ্‌গা॥

তারা পৃথ্বীরাজকে ঘিরে ফেলল; মহা যুদ্ধ হল তাদের সঙ্গে।

রাজ রুক্‌খে অরী।
সিংহ রোহং পরী॥
খঞ্জরং খোলিয়ং।
বীর সা বোলিয়ং॥

শাহাবুদ্দিন ঘোরীর দিল্লী বিজয়ের অনেক আগে থেকেই হিন্দু রাজারা তাতার সৈন্য ও সেনাপতি নিজেদের দলে মাইনে করে রাখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারা নিজেদের ও বিদেশী স্বধর্মীদের সুবিধা হবে বলে হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঝগড়া জিইয়ে রাখতে সহায়তা করত। তাদেরই সুবিধা নিয়ে বার বার মুসলমান

আক্রমণকারীরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে ও লুঠপাট করতে সাহস পেত। কিন্তু জেগে যারা ঘুমোত তাদের চোখ কখনো খোলে নি।

পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তা বিজয়ীর বেশে দিল্লী ফিরে এলেন।

চাঁদ কবি এখানে আরও একটি কাহিনী লিখেছেন, যার উল্লেখ অন্য কোন বইয়ে নেই। কিন্তু রাজপুত চরিত্রের একটা বড় গুণ শরণাগত রক্ষার একটা সুন্দর উদাহরণ হিসাবে সে কাহিনীটির দাম আছে। শাহাবুদ্দিন ঘোরী নিজের এক পাঠান সর্দারের প্রেমিকার প্রতি মুগ্ধ হলেন। বিপদ বুঝতে পেরে সর্দার প্রেমিকাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজের আশ্রয়ে পালিয়ে এল। ঘোরী তাদের ফিরিয়ে দিবার জন্য দাবি করলেও যারা তাঁর কাছে শরণ নিয়েছে তাদের পৃথ্বীরাজ বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। ফলে ঘোরী কয়েক বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই পৃথ্বীরাজ তাকে হারিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ঘোরীর মনে পরাজয়ের অপমানের সঙ্গে প্রেমিকাকে ফিরে না পাওয়ার বেদনা মিশে রইল।

গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনায় প্রমাণ হয়েছে যে, শাহাবুদ্দিন ঘোরী ছয় বারের বার ভারত আক্রমণের সময় যুদ্ধে জেতেন। তার আগে প্রায় প্রত্যেক বারই তিনি হেরে যান এবং দিল্লীর হিন্দু রাজা দু'বার তাকে বন্দী করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দু'বারই রায় পিথৌরা রাজপুতের চরিত্রগত উদ্ধত বীর ধর্মের অহংকারে তাকে মুক্ত করে দেন।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে ঘোরীর শেষ বার পরাজয়ের বর্ণনা প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের তবাকত-ই-নাসিরিতে খুব ভাল করে দেওয়া আছে। পৃথ্বীরাজের একজন সেনাপতি গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঘোরী রায়ের মুখে বর্শা ঢুকিয়ে দেন আর তার দুটো দাঁত ফেলে দেন। এদিকে রায়ের তরোয়ালের আঘাতে ঘোরীর হাতে এমন অসহ্য চোট লাগে যে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। নিরুৎসাহ হয়ে মুসলমান সৈন্যরা সবাই পালিয়ে যায় আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বর্শা দিয়ে খাটিয়া বানিয়ে তার উপর ঘোরীকে শুইয়ে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ বাঁচায়।

পরের বছরই ঘোরী আবার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন। তার এক লক্ষ কুড়ি হাজার ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে জম্মু আর কনৌজের হিন্দুরাও

যোগ দিল। (প্রমাণ--তবাকত-ই-নাসিরি ও আকবর-নামা।) শুধু তাই নয়। পৃথ্বীরাজের নিজের একজন বড় সামন্তও সুলতানের দলে এসে ভিড়ল।

পৃথ্বীরাজের দলে যোগ দিলেন চিতোরের রাণা (তখন নাম ছিল রাওল) সমর সিংহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মেবারী বংশ মুসলমানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছে। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি সমরসি (সমর সিংহ) সত্য সত্যই একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাদেবের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। সমস্ত রাজসিক ঐশ্বর্য ছেড়ে ভোগবিলাস ছেড়ে স্থির বুদ্ধি ও অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব নিয়ে রাজ্য চালাতেন। শুধু পদ্ম-বীজের মালা তাঁর গলায় শোভা পেত। মাথায় ছিল শিবের মত জটা আর সবাই তাঁকে যোগীন্দ্র বলে ডাকত। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে বহু সম্পদ তিনি নিজের প্রাপ্য হিসাবে পেতে পারতেন। কিন্তু সে সবই তিনি সৈন্যদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে তারাইন (=নারায়ণ=তিরৌরি) গ্রামে তিনদিন ধরে যুদ্ধ হল। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উত্তরা যেমনভাবে অভিমন্যুকে রণসাজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও সংযুক্তা তেমনি করে বীর পতিকে সাজিয়ে দিলেন। যে হাত দুটি দিয়ে পিতার শত্রুতা উপেক্ষা করে, স্বর্ণপ্রতিমাতে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সোনার বরণ করকমল দিয়ে শত্রুকে মারবার জন্য স্বামীর কোমরে তরোয়াল বেঁধে দিলেন। বিদায় দিলেন এই বলে যে, তুমি চৌহানসূর্য, তুমি এ জীবনে যশ আর সুখ দুই-ই যেমন ভাবে পেয়ালা ভরে পান করেছ, তেমন আর কেহ করেনি।

গীতার কথা মনে করিয়ে স্বামীকে সংযুক্তা বললেন, জীবন হচ্ছে একটি পুরানো কাপড়। এখন যদি তাকে ফেলেই যেতে হয়, তাতে ক্ষতি কি? বীরের মত মৃত্যুই হচ্ছে অমরতা।

বলতে বলতে সংযুক্তার হাত স্বামীর কোমরবন্ধ থেকে অজানতে সরে গেল। তার গন্ডারের চামড়ার বর্মের আঙটাগুলিকে চাঁপার ফুলের মত অঙ্গুলিগুলি আর খুঁজে পেল না। চাঁদের ভাষায়—ক্ষুধার্ত ভিখারী যেমন করে হঠাৎ একটা মোহর পেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তেমন ভাবে সংযুক্তার আঁখিতারা দুটি চৌহানের মুখচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষে, অপলকে।

এ দিকে যুদ্ধভেরী বেজে উঠেছে ঘোর গর্জনে। এ কি শুধু যুদ্ধের, না মৃত্যুরও আহ্বান? সংযুক্তার বুঝতে ভুল হল না এ বাজনা কিসের আবাহন!

পৃথ্বীরাজ চলে গেলেন। সৈন্যদের সবার সামনে গিয়ে হাতীতে চড়ে এগিয়ে গেলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামি তাজুল মাসির বইতে লিখে গেছেন যে, "কাকের মত মুখ নিয়ে হিন্দুরা হাতীর পিঠে চড়ে সাদা জয়ঢাক (অথবা শংখ?) বাজাতে লাগল; যেন নীল পাহাড়ের মুখ থেকে খর বেগে আলকাতরার নদী বয়ে যাচ্ছে।"

যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন হিন্দু সেনাপতি বাঙালী বীর উদয়রাজ।

পৃথ্বীরাজ অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। চাঁদের ভাষায়—

বজ্রপাত নিরঘাত। ধর্ম্মনি কৈ অম্বর তুট্টিয়।
দরিয়া দধি কিয় মথন। মন্ধি গিররাজ আহুট্টিয়॥

প্রাচীন বাংলা কবিতার ভাষা মনে রাখলে অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে না।

উট্টিরাজ পৃথ্বীরাজ বাগ মনৌ লজ্জ বীর নট।
কড়ত তেগ মন বেগ লগত মনৌ বীজু ঝট্ট ঘট॥
থাকি রহে সুর কৌতিগ গগন রগন মগন ভই শোন ধর।
হুদি হরষি বীর জগ্গুলে হুলসি হুরেউ রংগ নবরও বর॥

পৃথ্বীরাজ ঘোড়ায় উঠে এমনভাবে লাগাম নিয়ে ঘোড়া চালালেন যেন কোন বীর অভিনয় করছে। মানসের মত বেগে স্বচ্ছন্দে তরোয়াল খুলে চালাতে লাগলেন; যেন মেঘঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই কৌতুক দেখে আকাশে সূর্য থেমে গেল। রক্তে পৃথিবী লাল হয়ে গেল। বীরদের হৃদয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে উঠল আর তাজা রক্তের রং তাদের অংগে স্ফুরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু ঘোরীর সংগে ছিল "নলগোলা" (চাঁদের ভাষায়) অর্থাৎ বন্দুক। কাজেই যুদ্ধের ফলাফল অনেকটা ওতেই স্থির হয়ে গেল।

এদিকে পৃথ্বীরাজ বিদায় নেবার পরই সংযুক্তার শুকনো চোখে গড়িয়ে এল এক ফোঁটা জল। মনে মনে তিনি বললেন, আমি সূর্যলোকে আবার তার দেখা পাব; কিন্তু যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) আর নয়। প্রতিজ্ঞা করলেন যে স্বামীর সংগে দেখা না হওয়া পর্যন্ত শুধু জল খেয়ে জীবন ধারণ করবেন। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে স্বামীর পরাজয়, বন্দিদশা ও হত্যার খবর পেয়ে তিনি চিতার আগুনে আত্মদান করলেন।

এ সংসারে শুধু খারাপ ভবিষ্যৎবাণীগুলিই সম্ভবতঃ সত্য হয়। ভাল-

গুলি কেমন যেন ফলতে চায় না। যোগিনীপুরে রাজকন্যার রাজপুত্রের সংগে কখন আর দেখা ত' হল না। কিন্তু সূর্যলোকে হয়েছে কি?

হাসান নিজামি বলেন যে, যুদ্ধজয়ের পর ঘোরী আজমীঢ় দখল করে মূর্তি-পূজার মন্দির ও ভিত্তিগুলি ভেঙে ফেলে সেখানে মসজিদ ও মক্তব বসান। আজমীঢ়ের রায়কে প্রথমে শুধু বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তার শত্রুভাব কর্মোন দেখে পৃথ্বীরাজের হত্যার হুকুম দেওয়া হয়। "সেই পরিত্যক্ত হতভাগ্যের দেহ থেকে মাথা হীরের মত তরোয়াল দিয়ে খসিয়ে ফেলা হল।" মিনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পৃথ্বীরাজকে "নরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।"

চাঁদ কবি কিন্তু অন্য কথা বলেন। তিনি ছিলেন পৃথ্বীরাজের "লঙ্গোটিয়া মিত্র" অর্থাৎ জন্মকাল থেকে বন্ধু। তাঁর বন্দিদশা কবির সহ্য হল না। চোখের সামনে দেখলেন সংযুক্তার জহরব্রত, আজমীঢ়ের পতন ও আরো বহু অসহায় অত্যাচার। তাই তিনি পৃথ্বীরাজকে অনুসরণ করে গজনী পর্যন্ত গেলেন। সেখানে ঘোরীকে সন্তুষ্ট করে পৃথ্বীরাজের সংগে দেখা করলেন ও তাঁকে দিয়ে শব্দভেদী বাণ ছুড়িয়ে ঘোরীকে মারালেন। পরে কাটারী দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করে শত্রুর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন।

এই অংশটুকু ঐতিহাসিক না হতে পারে, কারণ চাঁদ কবি ত' নিজে হিন্দুস্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘটনা লেখেননি। কিন্তু কাব্যের দৃষ্টিতে এমনি একটা পরিণতি স্বাভাবিক হত।

সাংসারিক সত্যই ত' একমাত্র সত্য নয়। তার বাইরে ও উপরে অনেক সত্য, অনেক সত্যের চেয়ে বড় তথ্য বিরাজ করে। সমস্ত জীবনের অমৃতে সরস হয়ে ওঠে। সেই সত্যই আজমীঢ়ের রায় পিথোরার জীবনে এনে দিয়েছিলেন সংযুক্তা। সেই সত্যই তিনি মরণকে দিয়ে গিয়েছেন জীবনমাধুরী দিয়ে ভরিয়ে।

তাই ইতিহাসের নিষ্ঠুর আলোতেও ঝলমল করে শোভা পাচ্ছেন এই রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা।

॥ ৫ ॥

পুরানো প্রেমের কবিতার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। দেবলা দেবীর অমর প্রেমের বুকফাটা কাহিনী। তিনি ছিলেন গুর্জর রাজপুত বংশের পরম রূপসী রাজকন্যা।

সুলতান আলাউদ্দিনের বড় ছেলে খিজর খানের প্রতি তার প্রেম আর তার প্রতিদান নিয়ে অমরকাব্য 'ইশকিয়া' রচনা করেছিলেন আমীর খুসরো। শাহজাদা দেবল রাণীর প্রতি তার প্রেম সম্বন্ধে একটি কাব্য লিখতে খুসরোকে অনুরোধ করেন। যুবরাজ হৃদয়ের আবেগ নিজেই ভাল করে লিখে রেখেছিলেন। কবি খুসরো সেটিকে কাব্য-ছন্দে ঢেলে সাজিয়েছিলেন।

শাহজাদার আত্মপ্রেমকাহিনী পড়তে পড়তে কবি দেখলেন যে তার মধ্যে বেশীর ভাগ শব্দই হচ্ছে হিন্দি। হিন্দির তখন শৈশব চলছে। তবু কবি স্বীকার করলেন যে একটু ভেবে চিন্তে বিচার করলে দেখা যাবে যে হিন্দি ভাষা ফারসীর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। ফারসীতে শব্দের ঐশ্বর্য খুব বেশী ছিল না। আরবী যথেষ্ট পরিমাণে না মেশালে চলত না। কিন্তু কবির মতে হিন্দি আরবীর মতই পুষ্ট ভাষা ছিল। এর নিজের ব্যাকরণ অলংকার প্রভৃতি সবই ছিল। তিনি লিখেছেন যে হিন্দির এই গুণ-গানে তাঁর নিজের ভাই বেরাদররা আপত্তি করবে। কিন্তু, সেজন্য তিনি সত্যি কথা স্বীকার করতে পেছপা হন নি। কবির মতে যে গঙ্গা আর হিন্দুস্থান দেখেনি, সেই নীল আর তাইগ্রিস নদী নিয়ে অহংকার করবে। "যে বাগানে শুধু চীনের পাপিয়া দেখেছে সে কি করে জানবে হিন্দুস্থানের বুলবুল কি?......যে খোরাসানী প্রত্যেক হিন্দুকেই বোকা মনে করে সে পানকেও ঘাসের চেয়ে বেশী দাম দেবে না।......এবং যদি কেহ পক্ষপাতী হয়ে কথা বলতে চায় সে নিশ্চয়ই আমার (হিন্দুস্থানের) আমকে (বিদেশী) ডুমুরের নীচে স্থান দেবে।......তোমাদের হিন্দুস্থানকে স্বর্গস্থান হিসাবে দেখা উচিত।"

হিন্দিতে প্রাণ এনে দিল এক হিন্দু রাজকন্যার প্রেম আর মুসলমান কবির কলম। আমীর খুসরো হিন্দিতেও কবিতা লিখতেন। আর হিন্দি ও ফার্সী মিশিয়ে যে নতুন উর্দু ভাষা তৈরী হচ্ছিল তার গোড়া পত্তন করে গিয়েছিলেন।

জানতেন একদিন এদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই এ ভাষা চল হবে, আর কাজ চালাবার সুবিধা হবে। পৃথিবীতে খুব কম কবিই খুসরোর মত এত বেশী কবিতা লিখে গিয়েছেন। কাব্যপ্রতিভার জন্য তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল বুলবুল-ই-হিন্দ। তার মত কবির লেখনী নতুন গড়ে উঠা হিন্দির ঐশ্বর্য যে কত বাড়িয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

খুসরো তার নতুন ভাষাতে যে সহজ সরল ঢঙ এনে দিলেন, তার ফলে হিন্দি সংস্কৃত ভাষার অলংকার, রূপক, সমাস এসবের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল। মনের কথা মুখের সহজ ভাষায় প্রকাশ পেল। হিয়া ভরা দরদ দিয়ে তিনি লিখলেন,—

সখী. পিয়াকো জো মৈ ন দেখুঁ
তো কৈসে কাটুঁ অঁধেরী রতিয়াঁ।

যেন রাজেন্দ্রনন্দিনী শ্রীরাধার বিরহ আমাদের গাঁয়ের কোণের পল্লীবালার মধ্যে রূপ পেয়ে গেল।

এমনি সহজ সরল আবেগে খুসরো লিখলেন—

গোরী সোয়ে সেজ পর, মুখ পর ডারে কেস
চল খুসরো ঘর আপনে, রৈন ভই চহুঁ দেস।

আলাউদ্দিনের বিজয়বাহিনী তখন অক্টোপাসের বাহুর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ জয়ের নেশার সংগে মিশেছে ধনরত্ন লুটের লোভ। তার আগের সুলতান একবার এমন লুটের সামগ্রী পেয়েছিলেন যে তার সৈন্যরা সে ধন-রত্নের বোঝার ভারে দিনে এক মাইলের বেশী চলতে পারেনি। দক্ষিণ দেশে মাত্র একটা রাজ্য জয় করেই আলাউদ্দিন এত ঐশ্বর্য পেলেন যে তা একটা পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী ছিল। কবি প্রার্থনা করলেন যেন এই ভাগ্যবান রাজা "দিল্লীতে বসে থেকেই শুধু চোখের ভুরুর নাচনেই মালাবার দেশ ও সমুদ্রগুলি লুট করতে পারেন।"

মসনদ পাবার অল্প কিছু দিন পরেই আলাউদ্দিন গুজরাট আর সোমনাথ জয় করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। রাজা কর্ণরায়ের সমস্ত মণিমাণিক্য, স্ত্রী-পরিবার শত্রুর হাতে ধরা পড়ল। সে সবই সুলতানের কাছে ভেট হিসাবে এল। তার মধ্যে ছিলেন কমলা দেবী। রূপে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন তাকে নিজের হারেমে পাঠিয়ে দিলেন।

কমলা দেবীর দুই মেয়ে ছিল। দুটিই কর্ণরায়ের সঙ্গে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু বড়টি রাস্তায় মারা যায়, আর ছোটটি, দেবলা দেবী, বাপের সঙ্গেই পালিয়ে বেঁচে রইলেন।

এদিকে মাতৃস্নেহে অন্ধ কমলা দেবী মেয়েকে ছাড়া বাঁচা শক্ত মনে করলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে ধরলেন যে মেয়েকে তার কাছে এনে দিতে হবে। আলাউদ্দিন তখন একেবারে কমলা দেবীর হাতের মুঠোয়। তার উপর এমন একটা প্রস্তাবে কোন্ পাঠানের মন নেচে না উঠবে?

আবার সাজল বিরাট সৈন্যদল। ভয় পেয়ে কর্ণরায় গুজরাট ছেড়ে মেয়ে ও সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় চাইতে গেলেন দেওগিরের (দেবগিরি, দৌলতাবাদ) রায়-রায়ান রামদেবের কাছে। রায়-রায়ান দেবলা দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজপুত রাজার কাছে এমন প্রস্তাব নূতন নয়। তিনি রাজী হলেন, কিন্তু রাজকন্যা নিরাপদ আশ্রয় পাবার আগেই পাঠান সেনা এসে হানা দিল। একটা তীরের ঘায়ে দেবলা দেবীর ঘোড়া গেল খোঁড়া হয়ে। তিনি ধরা পড়ে দিল্লীতে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেলেন।

এদিকে শাহজাদা খিজর খানের বয়স হল দশ। ফুটফুটে বালককে দেখতে একেবারে ঠিক কমলা দেবীর ভাইয়ের মত। সুলতান চাইলেন দুজনের বিয়ে দিতে। কমলা দেবীরও আপত্তি ছিল না, কারণ খিজর খানের দিকে তার বুকে টান হয়ে গিয়েছিল। দুটি বালকবালিকা একসঙ্গে হেসে খেলে বাড়তে বাড়তে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলল। কবি লিখলেন:—

দো গুল বন্ দরেহ্ কে গুলসন শকরকন্দ।
বাবুয়ে ইয়ক দিগর অজ দুরই খুরসন্দ॥
দো শামা শকর অফশান-ই-শাবে আফরোজ।
জে সোজে এক দিগর উফতাদেহ্ দর শোজ॥
দো বেদিল রুবারু আওয়ার্দা মুস্তাক।
নজরহা জুফৎ ওয়া দুলহা জুফৎ ওয়ে তান্তাক॥

"দুটি গোলাপের ঝাড় বাগানে সুখে বিকশিত হল, তারা পরস্পরের সুরভিত সুগন্ধ আঘ্রাণ করে খুশীতে ভরে গেল। দুটি বাতি রাতে চাঁদোয়ার তলায় জ্বলে উঠল, তারা পরস্পরের জ্বলে উঠা আলো নিল। দুজন প্রেমিক প্রেমিকা যারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসুক ছিল তারা শেষ পর্যন্ত মিলে গেল। যদিও তাদের চোখ আর অন্তর আলাদা ছিল, দুটি দেহ এক হয়ে গেল।"

কিন্তু হায়, প্রেমের পথ এত মসৃণ নয়।

খিজর খানের মার এই বিয়েতে মত হল না। তিনি চান তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয়। ভাই আলপ খানেরও তাড়াতাড়ি এই শুভকর্ম সারার ইচ্ছা। কারণ শুধু যে তুর্কীর সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে বন্ধ হবে তা নয়, খিজর খানেরই যে পরে সুলতান হবার কথা।

অতএব রাজনীতি এসে প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। ওদের দুজনকে আলাদা করে দেওয়া হল। আলাদা ঘরে তাদের থাকতে হবে। তবুও তারা লুকিয়ে দেখা শোনা করতে লাগলেন, আর চারজন করে সখা-সখী তাদের গোপন প্রণয়বার্তা নিয়ে যাওয়া আসা করতে লাগল। যে প্রেম মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, তা ডালপালা মেলে চারার রূপ নিয়ে ফুঁড়ে বের হল।

সুলতানা এবার ঠিক করলেন যে দেবলাকে খিজরের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক করা হল যে লালপ্রাসাদে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুলতানের নিজের হারেমে। সে খবর পেয়ে খিজর খান্ পাগলের মত হয়ে গেলেন। নিজের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেললেন, দুঃখ সহ্য করবার শক্তি রইল না। শেষ পর্যন্ত ছেলে পাগল হয়ে যাবে এই ভয়ে সুলতানা তার মতলব বদলালেন। আস্তে আস্তে রাজপুত্র প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন, আর একদিন গোপনে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করলেন। ভাবের আবেগে সেদিন তাঁরা শুধু আত্মহারা নয়—জ্ঞানহারাও হয়ে গেলেন। বাজপাখীর মত দৃষ্টি থাকে তুর্কী নারীর। সুলতানার নজর এড়াল না।

আবার হুকুম হল লালপ্রাসাদের হারেমে যেতে হবে দেবলোকে। এবার যেতে হবেই। কোন ওজর আপত্তিতে ফল হবে না। যাবার পথে একবার ক্ষণেকের তরে দুজনে দেখা হল। রাজপুত্র রাজকন্যাকে দিলেন নিজের চুলের একটি গোছা স্মরণচিহ্ন হিসাবে, আর পেলেন রাজকন্যার চাঁপা ফুলের মত আঙ্গুলের আঙটি।

মনে রেখো, রেখো মনে।

সংসারে এর চেয়ে বড় করুণ মিনতি আর কিছু নেই।

হায় রাজপুত্রদের এ সংসারে নিজের মনের মত বিয়ে করার কোন স্বাধীনতাই নেই। রাজতক্তে বসে বা বসবার ইচ্ছা থাকলে হৃদয়ের হিসাব কষা চলবে না। সেই ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের খিজর খান—মায় এই শতকের ডিউক অব উইন্ডসর পর্যন্ত।

মামা আলপ খানের মেয়ের সঙ্গে খিজর খানের বিয়ে হয়ে গেল। সে যুগের শাহজাদাদের বিয়ের উৎসবে তামাসার সুন্দর বর্ণনা এখানে আছে। বিজয়তোরণ ত' তৈরী হলই। সে তো মামুলী ব্যাপার। নাচ, গান, দেওয়ালী, ভানুমতীর খেল—সে যা হল তার তুলনা নেই। মায় দাঁড় দাঁড় করিয়ে তার উপর নাচা পর্যন্ত। সেই রোপ-ওয়ার্কিং যা এখন একবার দেখাতে পারলে এই আজকের মায়াহীন বিজ্ঞানের জগতেও গোটা আমেরিকাকে গোড়ালীর উপর ভর করে দাঁড় করিয়ে ফেলা সম্ভব হত। "যাদুকর জলের মত একটা তরোয়ালকে গিলে ফেললে—যেন খুব তেষ্টা পেয়ে একজন শরবত খেয়ে ফেলছে। সে নাকের ভেতর দিয়ে একটা ছোরা বিঁধিয়ে দিল। ছোট ছোট কাঠের ছোট শরীরের ভিতর থেকে বড় বড় শরীর বের হতে লাগল। একটা জানালার ভিতর দিয়ে একটা হাতীকে, আর একটা ছুঁচের ভিতর থেকে একটা উটকে বের করা হল। বহুরূপীরা অনেক রকম ঠগবাজী দেখাল। কখনো দেবদূত, কখনো রাক্ষসের চেহারা তারা ধারণ করল।......তারা এমন মনগলান গান ধরল যে মনে হল যে কোন মানুষ মারা যাচ্ছে, আর তার খানিক পরে আবার বেঁচে উঠল।"

এমনি জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে ত' শাহজাদার বিয়ে হয়ে গেল। এদিকে দেবলার দিন কাটে কি করে? তিনি অনেক অনুযোগ করে চিঠি লিখলেন, কিন্তু যা উত্তর পেলেন তাকে অসহায়ের অজুহাত ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? দুজনেই দুঃখে ব্যাকুল হয়ে অসহায়ের সহায় সেই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সুলতানার মন গলল। মুসলমান শাস্ত্রে চারটি স্ত্রী রাখা যায় এটা তাকে বোঝান হল। তিনি দেবলার সঙ্গে খিজরের বিয়েতে রাজী হলেন। আর আলাউদ্দিন ত' আগেই মত দিয়ে রেখেছিলেন। লালপ্রাসাদ থেকে আনিয়ে দেবলার বিয়ে দেওয়া হল। এবার এত আনন্দ হল যে কবি লিখলেন—

সুলতানা সুখী অতি হরষে
ধমনীতে বেগে খুন নাচে
পরনে গহনা সম সরমে
হিয়া যেন চুনী সেজে আছে।
দুটি আঁখি হরষেতে ভার
চকমকি' ফুটে উঠে সুখে,

দুটি কানে মুক্তা লহরী
হেসে ওঠে যেন টুকটুকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। এই দুই নিরীহ দম্পতীর প্রেমেও ছিল কারো অভিশাপ। এত ভালবাসা ও বিরহ সহ্য করার পর মিলন হল, কিন্তু সুখ হল না।

সীমাহীন শারীরিক অত্যাচার ও উচ্ছৃংখলতার ফলে আলাউদ্দিনের স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ভেংগে যায়, আর মানসিক শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। তার পেয়ারের ক্রীতদাস মালিক কাফুরই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। খিজর খান্ বাপের সেরে ওঠার জন্যে মানত করে পায়ে হেঁটে তীর্থে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সুলতান একটু সেরে উঠলেন আর শাহজাদারও পায়ে পড়ল ফোস্কা। অনুচররা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘোড়ায় চড়াল। এদিকে মালিক কাফুর রঙ চড়িয়ে খারাপভাবে এই অবিবেচনার ব্যাখ্যা করল। সুলতানের অপমান করেছেন শাহজাদা। সত্যি কথা বলতে কি—তার আরোগ্য হওয়াই চান না তার সুযোগ্য পুত্র।

ব্যস্।

সংগে সংগে নিজের শালা আর ছেলের শ্বশুর আলাপ খানের গেল গর্দান তারপর ছেলের কাছে গেল নির্মম চিঠি—আমার দেওয়া রাজছত্র, 'দরবাস' জয়ধ্বজা, হাতী, ঘোড়া, মোটমাট যত খেলাৎ পেয়েছ সব দাও পত্রপাঠ ফিরিয়ে, আর আবার হুকুম না হওয়া পর্যন্ত আমার সামনে হাজির পর্যন্ত হয়ো না। থাক নির্বাসনে গংগার ওপারে পাহাড়ী তরাইয়ে শুধু শিকার আর জংলী পশুদের নিয়ে।

এই ফরমান পাঠান হল সবচেয়ে কদাকার এক দূতকে দিয়ে। চোখের জলে ভাংগা বুক নিয়ে শাহজাদা সব খেলাৎ ফিরিয়ে দিয়ে গংগা পার হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু মাত্র দুদিন পরেই আর ধৈর্য ধরতে না পেরে তিনি বিনা হুকুমেই মরণোন্মুখ বাপের কাছে ফিরে এলেন। পিতা মার্জনা করলেন, কিন্তু রাজা মালিক কাফুরের ফন্দীতে অন্ধ হয়ে নিজে সেরে না উঠা পর্যন্ত খিজর খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। তার মা মালিকা-ই-জাহানকে লাল-প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক হল যে যেন "একটা আত্মা দু টুকরো হয়ে গেল।" কাফুরকে দিয়ে সুলতান শুধু শপথ করালেন যে শাহজাদার প্রাণহানির চেষ্টা যেন না করা হয়। এর বেশী

আর কিছু করার মত মানসিক শক্তিও দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের মধ্যে বাকী ছিল না। "শুধু ছিল একটা ভারী হৃদয়, আর আহত আত্মা।"

আমীর খুসরো ছবির মত ভাষা দিয়ে সুলতানের অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। শাহানশাহ হয়ে গিয়েছিলেন "নিমজান বা জানুলুরগম" অর্থাৎ বেদনায় ভরা শরীরে প্রায় আধমরা, আর "মান্দ নিম্ ই জান্ দর্হম্" অর্থাৎ দু টুকরো করে কাটা শরীরের মত।

সেইখানে, সেই শত ঐতিহাসিক হত্যার স্মৃতি আর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ঘেরা গোয়ালিয়র দুর্গে দেবলারাণী নিজে যেচে এই দুঃখময় কারাবাসের সঙ্গী ও সান্ত্বনা হয়ে স্বামীর সঙ্গে রইলেন।

আলাউদ্দিনের আর বেশীদিন বাকী ছিল না। তার মৃত্যুর পর চটপট করে কাফুর সুলতানের একটা উইল বের করে সবাইকে দেখিয়ে পাঁচ বছর বয়সের সব চেয়ে ছোট শাহজাদাকে মসনদে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালিয়রে একজন অনুচরকে পাঠিয়ে খিজর খানকে অন্ধ করে দিল। কারণ তারই যে সুলতান হওয়ার কথা ছিল।

কবি দুঃখ করে লিখেছেন—

ব্যথা যাহা পেত সুর্মা পরশ মাখিতে
এ হেন দুঃখ কেমনে সহে সে আঁখিতে?
নার্গিস ফুলী আঁখি হ'তে খুন নিকালে,
সরাব উলটি করে যেন পাড় মাতালে।

কিন্তু আলাউদ্দিনের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ হল না। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ আর তা ভুলতে পারে না। কাজেই কাফুর এখন আর একজন শাহজাদাকে অন্ধ করে ফেলবার জন্য নিজের নাপিতকে পাঠাল। তার পর আলার যত ছেলে বা ওয়ারিশ, যে যেখানে ছিল, সবাইকে বন্দী করল, আর প্রাণে মেরে ফেলল শেষ পর্যন্ত। হাতের পুতুল হিসাবে সবচেয়ে ছোট নাবালক শাহজাদাকে তক্তে বসাল। আলাউদ্দিনের সুলতানার সব সোনারূপা জহরত কেড়ে নিল। এমনকি, তার ক্রীতদাসগুলিকে পর্যন্ত মালিক কাফুর মেরে ফেলল। কারণ ভবিষ্যতে তারাও হয়ত কোনদিন তখ্ত দখল করে বসতে পারে। শাহাজাদা কুতুবকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হল। সুবিধামত তার বড়

ভাইয়ের চোখের মত তারো চোখ দুটি "ক্ষুর দিয়ে যেমন করে খরমুজা কাটে*" তেমন ভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলার মতলব তৈরী হয়ে গেল। কাফুর অবশ্য নিজেই অল্প দিনের মধ্যে খুন হয়ে যায়, আর তার প্রতি খিজর খানের অভিশাপ সফল হয়। তবু তিনি এত বড় শত্রুর হত্যার খবরেও দুঃখিত হয়ে ধুলোতে মাথা ঘষে ঘষে শুধু নিজের কষ্টের জন্য নয়, শত্রুর জন্যেও চোখের জল ফেলেছিলেন।

এর পর খিজরের ছোট এক ভাই কুতুবুদ্দিন বাপের আমলের পাইকদের কল্যাণে বাদশা হয়েই সুখের স্রোতে ভাসতে শুরু করলেন। মাত্র সাড়ে চার বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু মদ খাওয়া, গান বাজনা শোনা, চরিত্রহীনতা আর স্ফূর্তি করা, উপহার বিলান আর কুপ্রবৃত্তি. চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোন কিছুতেই হাত দেন নি।

শ' দেড়েক বছর আগে ইংলণ্ডের ইতিহাসে রিজেন্সী রেকস্ নামে একদল লক্কা পায়রা রাজসিংহাসনের চারদিকে ঘুর ঘুর করে নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ ও অপকীর্তি করেছিল। এজন্য তাদের বদনামের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই সময়ে দিল্লীর সুলতানের চারপাশে যা চলছিল, তার তুলনায় বিলাতী কান্ড-কারখানা নেহাত নিরামিষ ব্যাপার।

খুশ্‌ক-ই-লাল, অর্থাৎ লাল রাজবাড়িতে এমন কি লোকের চোখের সামনে পর্যন্ত সুলতান দিনেরাতে সমানভাবে ঢলাঢলি শুরু করলেন। মদ আর অন্যান্য নেশার দোকান এবং নারী বেচাকেনা প্রকাশ্যভাবে চলতে লাগল। রূপসী রমণীদের আর দেখতে পাওয়া গেল না। একটি কিশোর বালক বা সুন্দর খোজা বা রূপসী কিশোরী পাঁচশ বা হাজার বা বড়জোর দু হাজার টংকাতে বিকাতে লাগল।

সেই সময়কার মাত্র তিনশো বছর আগে ১০০০ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ এদেশে যখন মুসলমানের হানা সবে শুরু হয়েছে, তখন গজনীর সুলতান মামুদের সভাপণ্ডিত আল বেরুনী (যদিও তিনি বিদেশী ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভাল করে এ দেশকে বুঝতে ও জানতে কোন স্বদেশীয় সে যুগে চেষ্টা করেনি) দেখেছিলেন যে, হিন্দু মেয়েরা খুব শিক্ষিত ছিল। তারা খেলত, নাচত, ছবি আঁকত। সব রকম সর্বজনীন ব্যাপারে প্রকাশ্যে সক্রিয় অংশ নিত। ১২০০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পাকাভাবে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তার মাত্র

* এই উপমাটা ঐতিহাসিক বরনীর।

একশ' বছরের মধ্যে দিল্লীর সুলতানের নাকের সামনে অর্থাৎ অন্তত যেখানে লোকে সুশাসন আশা করতে পারে, সেখানে এভাবে লোকের জীবনযাত্রা শুরু হল। সারা শহরটাই যেন দৌলতখানা-ই-জৌলুষে পরিণত হল। বোতল বাহিনী থেকে আরম্ভ করে সব রকম পঞ্চমকার ও অস্বাভাবিক অপকর্ম পর্যন্ত লোকের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

এ হেন আবহাওয়ায় নির্লজ্জ নিষ্ঠুর কুতুব দাদাকে হুকুম করলেন, দেবলাদেবীকে আমার হারেমে পাঠিয়ে দাও পত্রপাঠ।

খিজর খান, অন্ধ অসহায় খিজর খান এই সংকটের সময়ে যে মনের জোর দেখিয়েছিলেন তা আরো আগেই দেখান উচিত ছিল। মাথা উঁচু করে অন্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বের বিষ আর সাহস ঢেলে তিনি বললেন—

যতদিন আমার প্রেয়সী আমার কাছে আছে, বরং আমার মাথা কাটা যাবে সেও ভাল, আমি তাকে ছেড়ে দিব না।

আর দেবলাদেবী? তাঁর কি উত্তর হয়েছিল তা সেই অলিখিত পুরাকাল থেকে আজো সব হিন্দু নারী নিজের মর্মে মর্মে জানেন।

কুতুবুদ্দিন অন্ধ দাদা ও অসহায় বৌদিদির এই স্পর্ধার শাস্তি দিতে দেরি করল না। তার নিজেরই জীবনের উপর একটা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর সে ভাবল যে এবার সিংহাসনের আর কোন দাবিদারের সম্ভাবনাও রাখা ঠিক হবে না। এতে তার বন্দী ও অন্ধ ভাইদের অবশ্য কোন হাতই ছিল না। তবে বিপদের জড় মেরে দেওয়াই ভাল। তাই সে নিজের দেহরক্ষীদের সর্দারকে (শিল্লেদার) গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দিল তিনটি ভাইকেই হত্যা করবার জন্য।

ঘাতকরা ঢুকল বন্দীর ঘরে। অন্ধের শেষ সহায় বাল্যের প্রণয়িনী, কৈশোরের পত্নী, বন্দীদশায় সঙ্গিনী দেবলাদেবী দুটি হাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। ওগো তোমায় মরতে দেব না, তোমায় আমার অবল অসহায় এই হাত দুটি আড়াল করে রাখবে সব বিপদ, সব আঘাতের হাত থেকে। ওগো, ওগো, আমার যে এই হাত দুটি ছাড়া আর কোন বর্মই নেই তোমাকে রক্ষা করবার জন্য।

দেবলাদেবীর সেই সুন্দর বাহু দুটি ঘাতকের তরোয়ালের আঘাতে স্বামীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেটে মাটিতে পড়ে গেল। যে হাত দুটি চার হাত এক হাত হয়ে যাবার পর স্বামীর কাছ ছাড়া হয়নি কখনো।

কিন্তু রক্তের ডাক এখনো শেষ হয়নি। কুতুবুদ্দিন নিজেও অসচ্চরিত্রতার

শেষ সীমায় এসে এক নীচ বংশের তস্য নীচ পেয়ারের ক্রীতদাসকে সব ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রিয়পাত্র খসরু খানই শেষ পর্যন্ত কুতুবুদ্দিনকে এক রাতে নিজে গুপ্তহত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে খিজর খানের হত্যার পর দেবলাদেবীকে জোর করে কুতুবুদ্দিনের হারেমে নিয়ে আসা হয়। আর পরে গুপ্তঘাতক সুলতান খসরু খান পর্যন্ত তাকে দখল করে। ঐতিহাসিক বরনী এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। মনে মনে প্রার্থনা করলাম যে, এই নারীত্বের যেন এমনভাবে তিলে তিলে অধম মৃত্যু না হয়ে থাকে।

কিন্তু অমর প্রেম?

যে প্রেমের গাথা কবিরা যুগে যুগে গেয়েছেন, যার মহিমা আমাদের দেয় আশা, দেয় ভাষা, দেয় সান্ত্বনা সেই প্রেমের কি এই হল শেষ পরিণাম?

খিজর খানের হত্যার পর তার আত্মা যেন দেবলাদেবীর সঙ্গে সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল। ইহলোকে যারা সব দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিয়েও একসঙ্গে ছিলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ টেনে আনতে পারে নি। তাই ত' দেবল রাণী বলেছিলেন—

কে য়্যা জানে মন ও আশক-ই-জানম্
কে দরকারে তু শুদ জান-ও-জাহানম্॥
চো মন বেহেরং জে জান করদম জুদাই
মুবারীর জে আশনাইয়া আশ্নাই॥
বেহার জায়কে খুন রান্দ্ ইন্ তনে পাক
গয়া মহর মাহিদ রুস্তন অজ্ খাক॥
জো খুন-ও-মাকিম ইন রঙ্গীণ গয়া জোয়ে
পাজান গো গর্দে সুর্খ ঈন্ কীমিয়া জোয়ে॥

পরাণের প্রাণ ওগো পরাণ আমার
তব তরে বিসর্জিনু জীবন সংসার॥
শুধু তোমারই লাগি ত্যজেছি আত্মারে
ভুলো না আমার প্রেম ভুলো না আমারে॥
যেথাই আমার রক্ত পড়িয়াছে, মিতে
প্রেমসম দুর্বাদল গজাবে নিভৃতে॥

খুঁজে দেখো মোর রক্তে রাঙা মাটী সনে
সুজিবে রঙীন ধাতু প্রেম রসায়নে॥

এইটুকু বিশ্বাস ছাড়া প্রেমের নেই আর কোন সম্বল। দূর্বা ঘাস ছাড়া নেই কোন মনে করানর মত ধন।

॥ ৬ ॥

আগে প্রেম না আগে বিয়ে, সে নিয়ে কৈশোরে অনেকবার তুমুল তর্ক হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য প্রেম বা বিয়ে কোনটাই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল না। 'বিবাহের চেয়ে বড়' বস্তুটা যে ঠিক কি, সে সম্বন্ধে পাকা ধারণা গড়ে ওঠেনি তখনো। তাতে আরো তর্ক করাটা আরো বেশী নিরাপদ ছিল। নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা দিতে বসে এ নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছি। আর গলির মোড়ের নীলকণ্ঠ কেবিন মনে মনে দু'হাত তুলে বিয়ে আর প্রেম দু'টি বস্তুকেই আশীর্বাদ করেছে।

বলুন ত' মশায়, এমন একটা গরম বিষয় নিয়ে পাড়ার পাইকারী পার্কে বসে জমাট আলোচনা কি করে করব? গুরুজনরা আছেন। অন্তত দাদাশ্রেণীর মাতব্বরদের কান সজাগ হয়ে উঠবার ভয় আছে। তার পরই কত রাতে বাড়ি ফেরা হয়, য়্যানুয়াল পরীক্ষায় কোন্ সাবজেক্টে কত নম্বর যোগাড় করা গেছে, এসব অসুবিধের কথা সকলের মনে জেগে উঠতে পারে। কাজেই বেঁচে থাকুক নীলকণ্ঠ কেবিন।

তা দেখলাম যে বৈঠকখানা বদলাতে পারে, কিন্তু বৈঠক বদলায় না। না হলে কোথায় উত্তর কলকাতার বাহাত্তুরে গলি আর কোথায় উদয়পুরের মহারাণার সহেলিয়োঁ কি বাড়ি! না, ওটা বাংলা দেশের মামুলী গেরস্ত বাড়ি নয়। রাজোয়ারাতে বাড়ি মানে হচ্ছে বাগান। সখীদের বাগান।

মন নেচে উঠল রোম্যান্সের গন্ধ পেয়ে। আহা, রাসলীলা করতেন না কি মহারাণারা এখানে? সে কোন্ যুগে? কোন্ লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজের সংগে মিশিয়ে যেত শত সখীদের ঝুমুরের ঝুমঝুম? বর্শার বদলে ছোড়া হত ফুলঝারি? রক্তের বদলে ছড়িয়ে পড়ত রাঙা আবীর কুঙ্কুম? কাদের গায়ে?

মনের আবেগে একেবারে রাজস্থানের চাঁদ কবিকেই স্মরণ করে ফেললামঃ—

বিগসি কমল মৃগ ভ্রমর বৈন খঞ্জন মৃগ লুট্টিয়া।
হার কীর জরু বিম্ব মোতি নখল সিখ তাহি ঘুট্টিয়া॥

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন সঙ্গের মেবারী মহোদয়রা। না, ওরা অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক। অন্যান্য অনেক দেশী রাজ্যের চেয়ে অনেক তফাৎ ওদের আচার আর রীতি-চরিত্র। বিয়ে ওরা করতেন শুধু বংশরক্ষা নয়, বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে। কারণ, প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই দেখা যেত যে, বংশে বাতি জ্বালাবার লোকের অভাব হয়ে যাবার দাখিল হয়ে গেছে। কাজেই বহু বিবাহেরও রেওয়াজ থাকত। আর নারী বা অন্যান্য পঞ্চমকারের মধ্যে ওরা কখনো থাকতেন না।' ঢলাঢলি বা ওই জাতীয় হাল্কা আমোদ-প্রমোদ যা উদয়পুরে কখনো কখনো কেউ করেছে তা অন্যান্য রাজরাজড়ার দরবারের তুলনায় নেহাতই নিরেমিষ কারবার।

দিল্লীর দরবারের কাহিনীগুলি ভুলিনি। তাই শুধোলাম,—আপনারা কি প্রেমও করতেন না, না কি?

শিকার পার্টি থেকে ফেরার সময় মহুয়া গাছের তলায় বসে একবার একজন হিজ হাইনেস জোর গলায় রাজপুতের প্রেম করা অস্বীকার করেছিলেন। এঁরা তার চেয়ে একটুও কম গেলেন না। বরং একটু বেশীই এগিয়ে গেলেন।

বললেন,—আমরা একটু অল্প বয়সেই, অর্থাৎ সময় থাকতে আগেভাগে নিরাপদে বিয়ে সেরে রাখি। আর জানেন ত' ইংরেজদরদী কবিরা বলেছেন যে, বিয়ে হচ্ছে প্রেমের সমাধি। বিয়ে হলেই সব রোম্যান্স একেবারে হাওয়া হয়ে যায়।

বাধা দিলাম—অর্থাৎ আপনাদের জীবনে দক্ষিণের হাওয়া কখনো বয় না বলতে চান?

আরে রাম কহ! দিল্লীর পূব হাওয়াতেই আমাদের উতলা করে রেখেছে সেই পাঠান আলাউদ্দীনের সময় থেকে। আমরা দখনে হাওয়ার সঙ্গে দোলা খেতে সময় পেলাম কখন?

তা অবশ্য বটে। দিল্লীর পূবালি বায় উদয়পুরকে সব সময়ই যে দোলা খাইয়েছে তা হোরী খেলবার সময়কার হিন্দোলা নয়। পাঠান মোগলরা তেড়ে আসত লড়াই করতে। তরোয়ালের জবাব দিতে হত তরোয়াল দিয়ে। মেবার কখনো দিল্লীকে মেয়ে বা মোহর নজরানা দেয়নি। কিন্তু এই এবার দিল্লী

যাচিয়ে দেখতে হত যখন তখন। আপত্তি করলেই দরবার থেকে পুলিপোলাও চালান সেই সুবা দক্ষিণে বা তার চেয়ে মুশকিলের সুবা কাবুলে। এমন কি শুধু নির্বাসন নয়, বেকার হয়ে বসে থাকার ভয়ও ছিল। কাজেই বাদশাজাদারা মসনদের আশা বা বাদশার আয়ু সম্বন্ধে একেবারে স্পিকটি নট।

এ সম্বন্ধে একটা কাহিনী থেকেই ব্যাপারটা কত জটিল ছিল, তা বুঝতে পারা যাবে। মোগল দরবারের কাহিনী। কিন্তু ওদের মহৎ দৃষ্টান্ত রাজস্থানেও কোন কোন দরবারে নকল করা হতো কখনো কখনো।

আওরঙ্গজেবের বাঁচবার আর বিরাট সাম্রাজ্য চালানর ক্ষমতা উপভোগ করবার সাধ ছিল অসীম। তাই বুড়ো বাপ মরা পর্যন্ত তাঁর তর সয়নি। কিন্তু হাতে হাতে কর্মফল পাবার ভয়টিও ত' আছে। কাজেই তিনি যে বুড়ো হলেও অক্ষম হননি আর লড়াই করবার ইচ্ছা মজ্জার মধ্যে সজাগ আছে, তা দেখাবার জন্য কত কিছু ছলাকলাই না করতেন! তাঞ্জামে চড়ে চলেছেন সৈন্যদলের সঙ্গে। খুলে নিলেন তলোয়ার; ডাইনে বাঁয়ে চালিয়ে যেন বাতাসকেই টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগলেন। শেষে নরম কাপড়ে তা মুছে নিয়ে সযত্নে খাপে ভরে রাখলেন। মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। তীর-ধনুক নিয়েও সেই একই অভিনয়। বিশ্বজন দেখে রাখুক, আমি বিশ্ববিজয়ী আলমগীর আশীর কোঠায় পা দিলেও শক্ত-সমর্থ সম্রাট আছি।

এহেন আওরঙ্গজেব তাঁর ছেলেদের শুধালেন—তোমরা কে সম্রাট হতে চাও?

কে না হ'তে চায়, বরং সে প্রশ্নটাই করা বিবেচনার কাজ হত। তাই না? বলুন তো?

শাহ আলম সবিনয়ে বললেন—জাঁহাপনা, যদি কখনো বিশ্রাম সুখ ভোগ করবার জন্য রিটায়ার করতে চান, তা হলে তখ্‌ত তাউস আমারই প্রাপ্য। এহেন সব সদ্‌গুণের অধিকারী বড় ছেলেরই ত' রাজা হওয়া উচিত। তবে জাঁহাপনা, যতদিন বেঁচে-বর্তে আছেন, ততদিন অবশ্য শাহজাদার চুপচাপ থাকাই কর্তব্য।

আজম তারা নিবেদন করলেন—আমি ত' তখ্‌তে বসবার জন্যেই জন্মেছি। কারণ, আমার বাবা আর মা দু'পক্ষই মুসলমান আর রাজবংশের লোক।

আকবর উত্তর দিলেন—আমার জন্ম হয়েছিল শুভ লগ্নে। তারপর থেকেই ত' পিতৃদেবের কপাল খুলেছে। জন্মের বছরেই ত' তিনি অমুক অমুক যুদ্ধে জিতেছেন......ইত্যাদি। এর পর কি আর কারো তখ্‌তে হক জন্মাতে পারে?

আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন কামবক্স। মোগল সাম্রাজ্য একমাত্র তারই

হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে। তিনিই হচ্ছেন সম্রাটের পুত্র। আর ভাইরা সবাই শাহজাদার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছিল। তারপর আকাশে চোখ তুলে কামবক্স বললেন,—তবে অবশ্য আল্লার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

আওরঙ্গজেবের কিন্তু এসব উত্তর শুনে নিজের মনের কি ভাব হ'ল, তা মোটেই ভাংগলেন না। শুধু তাঁদের জানালেন যে, তাঁদের চান্স আসতে এখনো অনেক দেরী। জ্যোতিষীরা বলেছে যে, বাদশা আলমগীর একশ' কুড়ি বছর রাজত্ব করবেন। তাদের কথা একেবারে অভ্রান্ত। বলেই তেরছা চাহনিতে তিনি দেখতে লাগলেন, কোন্ ছেলের মুখে কি ভাব ফুটে উঠে। বা কেউ কোন জবাব দিতে চায় কি না।

বেচারাদের যে কতো আশা ভঙ্গ হয়েছিল, তা এটুকু থেকেই বোঝা যাবে যে, বাপের মৃত্যু পর্যন্ত তর সয়নি কারো। আকবর বাপের জীবদ্দশাতেই বিদ্রোহ করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাজপুতরা এমন ভাবে তার সহায়তা করেছিল যে, সুচতুর আওরঙ্গজেব জাল চিঠি দিয়ে তার রাজপুতদের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট না করে দিলে, বিদ্রোহের ফল কি হ'ত কে জানে? আর বাপের মৃত্যুর সংগে সংগে প্রত্যেক ভাই লড়াই করতে শুরু করেন।

কিন্তু এই প্রশ্ন আর উত্তর দেবার সময় সবাই ছিলেন চুপচাপ। তাঁদের চোখের সামনে ভাসছিল. আর এক ভাই শাহজাদা মহম্মদকে কেমন করে বন্দী করে রেখে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিলেন তাদের স্নেহশীল পিতা!

রাজার ছেলে থাকাই এত বিপদ। তার উপর জামাই থাকলে যে আপদ বেড়ে যায় আরও।

কাজেই এশিয়াতে রাজার ঝিয়ারীর সংগে প্রেম করাতে অন্য পক্ষেরও বিপদ থাকত। এই প্রেম পূব দেশে আর পশ্চিমে লোকে এক রকম নজরে কোনদিন দেখেনি। ফ্রান্সে প্রেমে পড়লে লোকে মজা দেখত, হাসি মস্করা করত, তার পরে ভুলে যেত। কিন্তু মিশর থেকে মংগোলিয়া পর্যন্ত হারেমের প্রেম আর হাহাকার হাত ধরাধরি করে একসংগে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে।

শাজাহানের সময়কার মোগল দরবারের কথাই ধরা যাক। রাজোয়ারার কাহিনীতে দিল্লীকে টেনে না এনে উপায় নেই। বিশেষ করে এজন্য যে, দিল্লী হারেমের সাচ্চা ঘটনা বহু লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজপুতানার জেনানার কোন খবরই কোথাও মেলে না। যুবরাজ দারা নিজে রাজা হতে পারলে, অসীম ক্ষমতাশালী বোন জাহানারাকে বিয়ে করতে দিতে রাজী হবেন, এমন

একটি ভরসা বোনকে দিয়েছিলেন। অনেকটা সেজন্যই সিংহাসন পাবার রক্তমাখা চেষ্টাতে বোন সহায় হয়েছিলেন। কিন্তু আগে ত' সাত মণ ঘি পুড়ুক, তার পরেই না রাধার নাচবার ফুরসত আসবে!

তবে ততদিন কি রাধা পায়ের মল গুটিয়ে বসে থাকবেন?

না, শাহজাদীরা সে রকম দুঃখের জীবন কাটাবার জন্য জন্মান নি। হারেমে বন্দিনী অবশ্য। কিন্তু উঁচু পাঁচীল-ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যেই সুখের নন্দন-কানন সাজাতে বাধা কি? ফরাসী ভ্রমণকারী আর শাজাহানের মাইনে-করা ডাক্তার বার্নিয়ার দুটি ঘটনার কথা লিখে গেছেন। এ দুটি যে একেবারে খাঁটি ঘটনা, রোম্যান্স বানাবার জন্য মন-গড়া কথা নয়, তা তিনি বিশেষ করে বলেছেন।

কিছুদিন ধরে একটি সুন্দর কিন্তু সাধারণ ঘরের যুবক লুকিয়ে লুকিয়ে জাহানারার কাছে যাওয়া-আসা করত। বড় শক্ত ব্যাপার! চারদিকে রয়েছে জটিলা-কুটিলার দল, যাদের নিজেদের ব্যর্থ যৌবন হয়ে রয়েছে মরুভূমি। একে জাহানারার অসীম ক্ষমতা আর বাপের উপর প্রভাবের জন্য সবার হিংসা। তায় আবার চোখের সামনে একজনের জীবনে বসন্ত বায় বইবে আর বাকী সবাই উত্তুরে হাওয়ার হিমেল ঠান্ডায় কুঁকড়িয়ে থাকবে? কাজেই সময় মত শাজাহানের কানে খবরটা তুলে দেওয়া হল।

রাতের অসময়ে মেয়ের শোবার ঘরে শাহানশার আসবার কথা নয়। কিন্তু সম্রাটকে ঠেকায় সাধ্য কার? লুকোবার শুধু একটা মাত্র ঠাঁই ছিল হাতের কাছে। নাগরকে চটপট লুকিয়ে ফেলা হল সেখানেই। এদিকে বাপ এসে চতুরা, রাজ-নীতিতে ওস্তাদ মেয়ের সংগে নানা রকম কথা আরম্ভ করলেন। মুখে নেই কোন রাগের ছাপ বা আশ্চর্য হওয়ার আভাস। কথায় কথায় দুঃখ করে বললেন যে শাহজাদীর গায়ের সোনার বর্ণ যেন মলিন হয়ে যাচ্ছে, সম্ভবত ঠিক মত গা ধোয়া হচ্ছে না আজকাল। বাপজানের প্রাণ মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক রকম ব্যাকুল হয়ে উঠল। এখনি মেয়ের ভাল করে স্নান করা দরকার। খোজাদের তিনি ডেকে পাঠালেন সংগে সংগে ফুটন্ত গরম জল হামামে তৈরী করে দেবার জন্য। চৌবাচ্চার নীচে জল ফুটাবার আগুন জ্বালান হল। শাহানশা সেখানে বসে বসে মেয়ের সংগে খোসমেজাজে আলাপ করে গেলেন যতক্ষণ না প্রেমের ফুটন্ত সমাধি হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে আবার প্রেমের ফুল ফুটল। নাজির খাঁ নামে একজন বিশেষ সুন্দর ও বুদ্ধিমান ইরাণী ওমরাহকে জাহানারা নিজের খানসামা করে নিলেন।

প্রেমের সঙ্গে মিশে রইল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর শাহজাদীর নেকনজরের সঙ্গে তাল দিয়ে গেল গোটা দরবারের পেয়ার। বাদশার সম্বন্ধে জ্ঞাতি-ভাই আর একজন প্রধান সেনাপতি শায়েস্তা খান প্রস্তাব করলেন যে, নাজির খানের সঙ্গে বেগম সাহেবার অর্থাৎ প্রধান রাজকুমারীর বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। এদের দুজনের গোপন প্রেম সম্বন্ধে শাজাহানের আগে থেকেই একটা সন্দেহ ছিল। এ অবস্থায় কি করলে ঠিক হবে, তা ভেবে নিতে শাজাহানের সময় লাগল না একটুও। একদিন ভরা দরবারে সবার সামনে তিনি এই ইরাণী ওমরাহকে বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন হিসাবে পানের খিলি উপহার দিলেন। দরবারী আদবকায়দা অনুসারে সে খিলি সঙ্গে সঙ্গে বিনা সন্দেহে নাজির খাঁ কুর্নিশ করে চিবিয়ে খেয়ে নিলেন। ঠোঁট লাল করে সারা মুখে খোশবই অনুভব করে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঞ্জামে চড়ে ফিরে চললেন প্রেমিক নিজের বাড়িতে। প্রাণ কিন্তু বাড়ি পেঁছবার আগেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেল!

এ ত' গেল বিয়ে না করে প্রেম করার কাহিনী। এবার ধরা যাক, বিয়ে করার পর আবার আর একজনকে বিয়ে করতে চাওয়ার জন্য প্রেমের কাহিনী। যার মধ্যে বিয়ে আর প্রেম একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

বাদশা হুমায়ুন দিল্লী থেকে তাড়া খেয়ে সিংহাসন ছেড়ে পলাতক হলেন রাজপুতানার ও সিন্ধুর মরুভূমিতে। এখানে এসে তাঁর নতুন করে প্রেম জেগে উঠল, যদিও মাথা গুঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত ছিল না। এ পর্যন্ত বলেই আমার সঙ্গীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। তারা সবাই মরুভূমিতেও যে প্রেম গজায়, তা অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন।

ওঁরা কিন্তু ততক্ষণে বিয়ে আর প্রেমের গল্পের মৌতাতে মজতে শুরু করেছেন। কেউ কোন কথা বললেন না। শুধু বীরবর মনোহর সিং সুন্দর পাগড়ীটা মাথা থেকে নামিয়ে রাখতে ওকে আরো বেশী আকর্ষণীয় অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং দেখাতে লাগল। ওদের বংশগত জায়গীর বেদলা থেকে উদয়পুরের নগরপ্রান্তে ফতেসাগবের ঢেউয়ের দোলা দেখা যায়। তারই দোলা বোধ হয় জেনারেল সাহেবের মনে একটু-আধটু কাব্যের ছোঁয়াও দিয়ে যায়।

বাদশা হুমায়ুনের এই প্রেমকাহিনী যে সত্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের জলের কুঁজোর বাহক জওহর থেকে আরম্ভ করে আরো অনেকে এই ঘটনা লিখে গেছেন। মরুভূমিতে হুমায়ুনের সৎমা (সৎভাই হিন্দালের মা) একটা ভোজ দিলেন। সে ভোজে হামিদা বলে একটি ছোট্ট-মোট্ট মেয়ে

বছরের সুন্দরী মেয়ে এসেছিল। ষোল বছরের হামিদা আর তেত্রিশ বছরের হুমায়ুন—রাজ্যহারা, পাঁড় আফিমখোর আর অন্তত ছ'টি বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী।

হুমায়ুনের সংবোন গুলবদনের লেখা থেকে জানা যায়, এই কমসে কম ছ'টি স্ত্রীর মধ্যে তিনটি শের শার সংগে যুদ্ধে হেরে পালানর সময় খোয়া গিয়েছিল। একটি শের শার হাতে পড়েন আর তাঁর কল্যাণে স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন এবং অন্য দুটি সম্ভবত পালানর হিড়িকে নদীতে ডুবে মারা যান। অভাগার ঘোড়া মরে আর ভাগ্যবানের বৌ মরে, এ ত' চল্তি কথাতেই আছে।

যাই হোক, ভাগ্যহীন হুমায়ুনের তখনো কয়েকটি বৌ বেঁচে ছিলেন। তবু দুর্ভাগ্য ত' আর প্রেমকে ঠেকাতে পারে না। সে বস্তুটি মরুভূমির বালির মত হৃদয়ের সব বন্ধ-করা দরজা জানালার ফাঁকে ফুঁকে কোথা দিয়ে কখন যে ভিতরে ঢুকে কায়েম হয়ে আস্তানা গেড়ে নেয়, অংক কষে তার হিসাব করা যায় না।

একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম? না, না, শুধু বিয়ের বাসনা নয়, নিখাদ প্রেম। তার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

প্রথম দেখার পরেই হুমায়ুন বিয়ের প্রস্তাব পেড়ে বসলেন। সংভাই হিন্দাল ত' চটেমটে লাল। নিজের চালচুলোর হিসেব নেই, তার উপর আবার নেই বয়সের গাছপাথর। তার আবার বিয়ে!

যেখানে ছেলেবেলাতেই বিয়ে হয়ে যায়, সেখানে তেত্রিশ নেহাত কম বয়স নয়। অবশ্য হুমায়ুন বলতে পারতেন যে মেয়েদের মত রাজারাজড়ারও বয়স কখনো বাড়ে না।

বড় বড় মোল্লামৌলানারা বলল যে, নিজে তুর্কী শুন্নি হয়ে ফারসী শিয়া মেয়েকে বিয়ে? ছিঃ, জাত কুল মান সবই যাবে!

আত্মীয়-কুটুমরা বলল—ছ্যাঃ, প্রথম দর্শনেই বিয়ের সম্বন্ধ, সে যে সমাজে বারণ। তার ওপর দুলহিনের জন্য দেন-মোহর (কনের পণ) দেবার মুরদ নেই পর্যন্ত।

আর কন্যা? তার নিজেরই মত নেই এ বিয়েতে। শুধু বয়সে নয়, লম্বাতেও হুমায়ুন এত বড় যে, ছোট-মোট হামিদাকে সংগে টুল নিয়ে ঘুরতে হবে যে!

কিন্তু হুমায়ুন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সংমা একটু ভরসা দিলেন।

তাড়াতাড়ি ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। পাখের কলম দিয়ে হুমায়ুন লিখতে বসলেন,—যেমন করে পার ওকে রাজী করাও। আমার মাথা আর চোখ খাও। আমি সব কিছুতেই রাজী।......আমার চোখ আশা করে পথের পানে তাকিয়ে আছে।

তার এত পীড়াপীড়িতে হিন্দালকেও শেষ পর্যন্ত এ বিয়েতে মত দিতে হল। মনে হল যে, এবার বুঝি বিয়ের ফুল ফুটবে।

খোস মেজাজে হুমায়ুন হামিদাকে আবার দেখতে চাইলেন। কিন্তু কন্যা তখনো রাজী নন।

কেন আমি বাদশার সঙ্গে দেখা করব? যদি তাঁকে সেলাম করতে যেতে হয়, সে ত' আমি সেদিন করেই সম্মানিত হয়েছি। বাদশাকে দু'বার করে সেলামের রীতি নেই।

রাজার মাথা সামান্য পণ্ডিত মশায়ের মেয়ের এই প্রত্যাখ্যান নীচু হয়ে সহ্য করে নিল।

হুমায়ুন এবার নানা দিক থেকে হামিদার মন গলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক লোককে কাব্যের ঢঙ্‌এ হংসদূত করে পাঠালেন। কিন্তু হামিদা মানেন না। বাদশাহকে একবার দেখাই আইন মাফিক; দ্বিতীয়বার দেখার নিয়ম নেই। আমি যাব না।

সৎমা এসে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলেন,—তোমায় ত' বাপু বিয়ে করতেই হবে কাউকে না কাউকে। তা, বাদশার চেয়ে ভাল পাত্র আর কে হতে পারে?

না, তবুও না।

শেষ পর্যন্ত হামিদা বলে বসলেন,—বিয়ে আমি এমন লোককে করতে পারি যাঁর কণ্ঠে আমার হাত পৌঁছাবে। যার শুধু কুর্তা পর্যন্ত আমার হাত যায়, তাঁকে নয়।

এই আপত্তিটা জেনে হুমায়ুনের খানিকটা আশা হল।

তবু চল্লিশ দিন ধরে সাধ্যসাধনা করার পর হামিদা হুমায়ুনকে বিয়ে করতে রাজী হলেন।

সেই নিষ্ঠুর অনিশ্চয়তার যুগে হুমায়ুনের ব্যাকুল মিনতিভরা প্রেমের কবিতা, রোম্যাণ্টিক যুগের যে কোন প্রেমের কবিতার সঙ্গে তুলনায় কম যাবে না। তিনি লিখেছিলেনঃ—

ভিখারী মিনতি করে, প্রিয়ে,
করো দয়া, মোর পানে চাও।
গুণ্ঠন নামে মুখ বেয়ে,
দরশন বাহিরেতে যাও।
সুখ আর ক্ষুধার মাঝারে
কেন রচো এত ব্যবধান?
মিছে, রাণী, ঘোমটা বাহারে
কাঁদাও যে মোর হিয়াখান।
ঢাকে রূপে যবনিকা নব
ঘোমটা তোমার হাতিয়ার;
ভিখ মাগি, জয় হোক তব
প্রিয়ে কাছে এস ত' এবার।

বন্ধুরা ভাঙেন, কিন্তু মচকান না। বললেন যে, এ কাহিনীতে অবশ্য মরুভূমিতে প্রেম গজাবার উদাহরণ আছে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীরা মরুভূমির 'ওয়েসিস' নন। মোগলরা যে হামেশাই প্রেমে পড়ত আবার হাবুডুবু খেয়েও উঠে পড়ত তা আর কে না জানে?

তাদের মতে সায় দিতে পারলাম না।—এমন অবস্থায় যদি হুমায়ুনের মনে প্রেম জেগে উঠতে পারে, তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেরই মনে প্রেম শুধু ঘাসের মত গজান নয়, ওয়েসিস বানাতেও পারে—রায় দিলাম আমি।

এই মতের সঙ্গে যোগ দিলাম একটি করুণ কাহিনী। নিষ্ঠুর হারেমের মধ্যেকার করুণ কাহিনী। ফুল পাথরে না ফুটতে পারে, কিন্তু তার আনাচে-কানাচে যে ফোটে তারই উদাহরণ।

দারাকে হত্যা করানর পর আওরঙ্গজেব তাঁর দুই স্ত্রীকে নিজের হারেমে চলে আসতে হুকুম দিলেন। আর্মেনিয়ান সুন্দরী উদিপুরী এক কথাতেই রাজী হলেন। প্রিয় বেগম হয়ে হাতের মুঠোয় পেলেন অনেক ক্ষমতা, পায়ের কাছে অনেক ঐশ্বর্য। আর রাজপুতানী রাণাদিল তাঁকে ডেকে পাঠাবার অর্থ শুধিয়ে পাঠালেন। জবাব এল যে, শাস্ত্র অনুসারে মৃত বড় ভাইয়ের স্ত্রী ছোট ভাইয়ের দখলে আসবার কথা। রাণাদিল তখন প্রশ্ন করে পাঠালেন—আমার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য বাদশা আমায় কামনা করেন?

আওরঙ্গজেব বলে পাঠালেন যে, তাঁর সুন্দর চুলের গোছা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। শুনে রাণাদিল তখনি তাঁর সব চুল ফেললেন কেটে, ভেট পাঠিয়ে দিলেন আওরঙ্গজেবকে। আর সঙ্গে ছোট্ট একটি লেখা জবাব—যে সুন্দর চুল ভাল লেগেছে তা এই পাঠিয়ে দিলাম; এখন নিরিবিলি থাকতে দিন।

কিন্তু বাদশা ত' শুধু সুচারু কেশের রাশি চাননি, চেয়েছিলেন তাঁকে। তাই এবার খোলাখুলি আহ্বান এল।—তুমি অপরূপ সুন্দর, তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই। ধরে নাও যে, আমিই তোমার দারা। দারার স্ত্রীর চেয়ে বেশী সম্মান তুমি আমার কাছে পাবে। তোমায় করব পাটরাণী।

রাণাদিলের মনে ছিল না কোন সংশয়, কোন সম্মান-সম্পদের লোভ। এক সময়ে তিনি ছিলেন সামান্য এক নর্তকী। সম্রাট শাজাহানের হারেমের অসংখ্য রূপসী 'কাঞ্চনী'দের (পেশাদার নাচওয়ালী) মধ্যে একজন। তাঁর অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে যুবরাজ দারা মুগ্ধ হন। শাজাহানের কাছে গিয়ে দারা তাঁর মনের কথা খুলে জানালেন। চাইলেন এই নর্তকীকে রীতিমত বিয়ে করতে। সম্রাট রাজী হলেন না। যুবরাণীর মনে দুঃখ হবে; তার আত্মীয়-স্বজনদেরও প্রতাপ খুব বেশী। নাঃ, এমন প্রস্তাবে রাজী হওয়া চলে না।

ব্যর্থ প্রেমে ব্যাকুল হয়ে দারা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত হাকিমরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ছেলেকে প্রাণে বাঁচাবার জন্য শাজাহানকে এ বিয়েতে মত দিতে হল। কাঞ্চনী রাণাদিল মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরী।

সেই রাণাদিল আওরঙ্গজেবের চূড়ান্ত আহ্বান পেয়ে ঢুকলেন নিজের কামরায়। ছুরি দিয়ে নিজের সুন্দর মুখখানা সম্পূর্ণরূপে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন। তারপর একটা কাপড়ে সেই তাজা রক্ত, রক্তিম রূপের আভায় ভরা রক্ত মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাদশার কাছে। আমার যে মুখের সৌন্দর্য বাদশা কামনা করেন, সেই সৌন্দর্য এই কাপড়ে পাঠিয়ে দিলাম। এতেই যদি তাঁর কামনা তৃপ্ত হয়, আমিও তৃপ্ত হব। আর কোন রূপ আমার বাকী নেই।

এই কাহিনী বলার পর খাস রাজপুত ঘরের প্রেমের গল্প শুনতে চাইলাম। বললাম যে, যতই আপনারা লড়াই করে থাকুন, আপনাদের হৃদয়ে প্রেম থাকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। বলুন এবার রাজপুতের প্রেমের কাহিনী।

তর্কে হেরে গিয়ে বীরপুরুষরা করুণ নয়নে এ ওর দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন। যেন ওরা কোন ডাকসাইটে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন;

আর কড়া হ্কুম হয়েছে যে, যার কাছে যা কিছ্ টাকাকড়ি ল্কোনো আছে বের করে দাও চটপট—নইলে জান গেল বলে।

কিন্তু রাজপ্তের জান যায়, তব্ মান মারা যায় না। রামগোপালজী বলে বসলেন—আমাদের এদেশে অবশ্য কোথাও কোথাও বিয়ে ছাড়াই প্রেম হয়ে গিয়েছে। তবে সেগ্লি হচ্ছে য়্যাক্সিডেণ্ট, নেহাতই দ্র্ঘটনা। মানে সদা-সর্বদা যা হয়ে থাকে তার বাইরের ব্যাপার।

আমার চোখে কি প্রশ্ন ফ্টে উঠেছিল, তা তিনিই জানেন। নদীতে ডুবে যাবার আগে লোকে যেমন খড়-কুটো পর্যন্ত আঁকড়িয়ে ধরে তেমন ভাবেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বললেন,—এ যেমন ধর্ন র্পমতী আর বাজ বাহাদ্রের কাহিনী।

র্পমতী ছিলেন মালবিকা। অর্থাৎ মালব দেশের রাজপ্তানী মেয়ে। র্পে, নাচে গানে, কবিতা রচনায় তাঁর তুলনা সারা হিন্দ্স্থানে একটিও পাওয়া যেত না। র্পমতীর র্পের কথা, কবিত্ব প্রতিভার কথা রাজোয়ারার লোকের ম্খে ম্খে ছড়িয়ে আছে। আজো নাকি মর্ভূমিতে নীরব নিশীথিনী তার কান্নাভরা গানে গানে ম্খরিত হয়ে ওঠে! শ্ধ্ দরদভরা কানেই না কি সে গান ধ্বনিত হয়। প্রাচীন রাজপ্ত চিত্রের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী রোম্যান্স হচ্ছে র্পমতীর নিশীথ অভিসার।

এখনও মালব দেশে সবচেয়ে মনমাতান চোখজ্ড়ান প্রাসাদ হচ্ছে র্পমতী মহল। ছবির মত একটা রাস্তা উঁচু পাহাড়ের একেবারে চ্ড়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তার শেষে, পাহাড়ের খাড়াইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে র্পমতী মহল।

আর তার প্রিয়তম বাজ বাহাদ্রের মহল হচ্ছে তার নীচে রেবাকুণ্ডের পারে।

এই পাহাড়ে শিকারে এসে গেঁয়ো কিন্তু নাচে গানে র্পে অতুলনীয় রাজপ্ত মেয়ে র্পমতীকে দেখে শেরশার পাঠান সামন্তের ছেলে বাজ বাহাদ্র প্রেমে পড়লেন। কিন্তু র্পমতী তাঁর কথা কানেও তোলেন না। তাঁকে কাছে পর্যন্ত আসতে দেন না। বাজ বাহাদ্রও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত র্পমতী একটি অসম্ভব শর্ত করলেন। রেবা নদীকে যদি পাহাড়ের উপর এনে দিতে পারে, তবেই পাঠান পাবে রাজপ্তানীকে।

তাই, তাই সই।

কাহিনী বলে যে, রেবা নদীর দেবী বাজ বাহাদ্রকে একটা গাছের শিকড়ের তলায় রেবার ঝর্ণাধারা খ্ঁজে পাবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেটা খ্ঁজে পেয়ে

সেই জলকে রেবাকুণ্ডের বাঁধে আটকিয়ে তিনি রূপমতীকে পাবার দাবি করলেন। এখন আর তাঁর না বলবার উপায় রইল না।

কাহিনী যাই বলুক, ঐতিহাসিক কাফি খান বলেন যে, আকবরের নতুন গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যের সেনাপতি অধম খান মালব দখল করতে গেলে বাজ বাহাদুর হেরে পালালেন। কিন্তু যাবার আগে নিজের হারেমের সব মেয়েদের খতম করে দেবার হুকুম দিয়ে গেলেন। মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু মেয়েদের মত জহর ব্রত বা সতী হবার নিয়ম নেই। তার উপর রূপমতী ছিলেন শুধু নর্তকী, বিবাহিতা স্ত্রী পর্যন্ত নয়। তবু পাঠানরা অনেককে জখম করল। আর অনেককে খুন। এমন সময় হাজির হল অধম খানের সৈন্যরা। ওরাও কিছু কম গেল না। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদাউনী নিজের চোখে দেখে-ছিলেন যে, "ভগবানের সৃষ্টি মানুষকে শাক, শশা আর মুলো"র মত মনে করা হয়েছিল।

রূপমতী সাংঘাতিকভাবে জখম অবস্থায় ধরা পড়লেন। কাতর কণ্ঠে বললেন,—আমায় এবার মরতে দাও।

বাজ বাহাদুরকে শুনিয়েছিলেন তিনি নিজের রচনা করা গানঃ—

আউর ধন জোরতা হ্যায়, রি মেরে
তো ধন প্যারেকে প্রীত পুঞ্জী।
আনে কে খতম কর্ রাখো মন মেঁ
তু প্রতিত তারো দেখা হুঁ॥

ক্রিয়া কা না লাগে দুষ্টা
আপনে কর রাখোগি কুঞ্জী।
দিন দিন বাঢ়ে গয়ায়ো
দুরহি খটন একো গুঞ্জী।
বাজ বাহাদুর কি স্নেহ্ উপর
নিছা চার করুঙ্গি জি আউর ধন॥

ওগো বন্ধু, অন্য লোকে তাদের ধন নিয়ে অহঙ্কার করুক। আমার ধন হচ্ছে প্রিয়ের ভালবাসা। তাকে মনের মধ্যে যত্ন করে সবটুকুই তালা দিয়ে রেখেছি। অন্য কোন ময়ে সেখান উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারবে না, কারণ চাবি আমার

নিজের কাছে। দিনের পর দিন সে প্রেম বেড়ে যাচ্ছে; একটু কণাও কমে না। বাজ বাহাদুরের সঙ্গেই সুখে-দুঃখে এই জীবন কাটাব।

এখন সেই প্রেমিকেরই জল্লাদদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েও রূপমতী শুধু বললেন,—এবার আমায় মরতে দাও।

অধম খান তাকে আশ্বাস দিলেন,—আমরা তোমায় সারিয়ে তুলব। তুমিও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর। সেরে উঠলে তোমার প্রিয়তমের কাছে তোমায় পাঠিয়ে দেব।

রূপমতী ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন। রূপও জোয়ারের মত ফিরে এল তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু প্রেমিকের কাছে ফিরে যাবার সময় এল কি এবার?

খবর পাঠালেন অধম খান,—রূপমতী, এবার চোখের জল মুছে তৈরী হয়ে নাও। আমি নিজেই তোমার অনুগ্রহের ভিখারী।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন রূপমতী। উত্তর পাঠালেন যে, তিনি শুধু একজনের বন্দিনী। অন্য কোন পুরুষের খেলনা হতে রাজী নন।

বন্দিনী রূপমতী মনের দুঃখে গান করতেন,—

তুম বিনা জিযরা রহত রহত মাংগত হৈ সুখরাজ।
রূপমতী দুখিয়া ভই বিনা বহাদুর বাজ॥

তোমার বিহনে হৃদয় বার বার সুখের জীবন আকাঙ্ক্ষা করছে। ওগো বাজ বাহাদুর ছাড়া যে রূপমতী দুঃখিনী হযে আছে।

কিন্তু যার হৃদয়ই নেই হৃদয়-গলানো দুঃখের গানেও তার পাষাণ গলবে কি করে?

অনেক মিনতি করলেন রূপমতী।

থোড়ো রাখো মান, আলিজা, থোড়ো রাখো মান।
হাথী মাংগু; ঘোড়া মাংগু, পৈদল পাঁচ পচাস
রণজীত বালে নগাবা মাংগু, উদয়পুরকে রাজ।
চাঁদী মাংগু, সোনে মাংগু, তাকে লড়তো তলাক।
বাঘ সারু বীরো মাংগু, চুড়িলা রী পতরাখ।

আমার সামান্য মান রাখো, আলিজা (অধম খান), শুধু মানটুকু বজায় রাখো। যদি আমি হাতী চাই, কি ঘোড়া চাই, কি পাঁচ কি পঞ্চাশ জন পদাতিক চাই; যদি আমি যুদ্ধের জয় ঘোষণা করার কাড়া-নাকাড়া চাই বা উদয়পুরের রাজপাট

চাই, বা রূপো কি সোনা চাই তাহলে তুমি আমায় ভাগিয়ে দিয়ো। কিন্তু বাঘ মারতো যে বীর আমি শুধু তাকেই চাচ্ছি। ওগো, আমার চুড়ির মর্যাদা রাখো।

হায় রাজপুতানীর চুড়ির মর্যাদা! মল্লার রাগে রচা এই মিনতির গানেও আলিজার মন গলল না।

—আচ্ছা বেশ। স্বেচ্ছায় না হয়, জোর করে তোমায় আমার আপন করে নিতে আমি জানি।

অধম খানের হুকুম শুনে রূপমতী তাকে অভিসারের সময় দিলেন।

সাজলেন তিনি সব চেয়ে দামী পোশাকে. সুন্দর গহনায়। ফুলে ফুলে সুরভিতে দীপমালায় ভরে গেল মিলনকুঞ্জ। বাইরে বাজতে লাগল রূপমতীর নিজের রচনা করা গানের সুর। ফুলশয্যায় শুয়ে রূপমতী নিজের হাতে টেনে দিলেন মুখের উপর ঘোমটা। যা বাধা রচনা ক'রে সাধকে দেয় বাড়িয়ে। এখনি যে আসবে বাসরশয্যায় নতুন প্রেমিক।

এলেন অধম খান। জলদে বাজতে লাগল গানের সুর। আরো যেন মদির হয়ে উঠল ঘরের মধ্যে দীপের মালা, ফুলের সৌরভ। আবেশে বিহ্বল হয়ে হাঁটু গেড়ে রূপমতীর মুখের উপর থেকে খসিয়ে দিলেন ঘোমটা নিজের অসহিষ্ণু হাতে। চকিতে যেন কাল সাপ দংশন করল তাকে ফণা তুলে। মৃত্যুর বিবর্ণ ছায়ার কাল সাপ।

বিয়ে হয়নি রূপমতীর বাজ বাহাদুরের সংগে। হয়নি কোন মিলনের বেদমন্ত্র পাঠ বা কাবিলনামায় সাক্ষী রেখে সই। পুরুষ তাঁকে শুধু জন্ম দিয়েছিল নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাচওয়ালীর সাধারণ জীবন যাপন করবার জন্য। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন একনিষ্ঠার জীবন। বরণ করেছিলেন মরণকে শুধু এক জন প্রেমিকের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বলে। মনোহরণের সব রকম ছলাকলায় নিপুণা একজন নর্তকী মাত্র। কোন একটি পুরুষের প্রতি নিষ্ঠায় তাঁর ছিল না প্রয়োজন; না ছিল পুরুষের কাছ থেকে কোন সহানুভূতির প্রত্যাশা।

তবু এই প্রেম এই পবিত্রতা নিষ্ঠার চিহ্ন হিসাবে তার ত' দরকার ছিল না হাতে কোন লক্ষ্মীর লোহা, সীমন্তে কোন সিঁদুরের ছোঁয়া। ঘরে ঘরে যাঁরা সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে যান, উলু দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে

স্বামী ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করেন, মনের গহনে তাদেরই এক জন হয়ে গেছেন নর্তকী মালবিকা রূপমতী।

উত্তর কলকাতার গলির মোড়ের নীলকণ্ঠ কেবিনের আড্ডা থেকে উদয়পুরের মহারাণার সহেলী বাগে তর্কাতর্কি পর্যন্ত সব আলোচনা. সব মানসিক প্রশ্নের এখানেই শেষ হোক, শান্তি হোক।

॥ ৭ ॥

ডাণ্ডা হাতে একদল বুনো মেয়ে হঠাৎ পথ রুখে দাঁড়াল।

আরে থামা, থামা, মোটর থামা। শশব্যস্তে খাঁটি বাংলায় হেঁকে উঠলাম আমি। ভুলেই গেলাম যে, এটা বাংলা নয়, রাজোয়ারা। শুধু রাজোয়ারাই যে তা-ও নয়। একেবারে ভীলোয়ারা অর্থাৎ ভীলদের দেশ। কে বা বোঝে বাংলা, কে বা বোঝে মেয়েদের হাতে ডাণ্ডা দেখে বাঙ্গালীর উৎকণ্ঠা!

হোলির দিনে এ কি অঘটন রে বাবা!

নেমে এলেন সামনের সীট থেকে মাথার পাগড়ী হাতে দোলাতে দোলাতে ঠাকুর সাহেব। বিপদে তিনি ঘাবড়ান না; বীরত্বে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। ব্যাপারটার একটা ইতিহাস আছে। রাজোয়ারার সব জহর ব্রত, গেরুয়া রঙের কাপড় পরে শত্রু মেরে মরা, জান দেঙ্গা তবু মান না দেঙ্গা, এসব অমর ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবার মত একটা ইতিহাস। সে গল্পটা—থুড়ি, গল্প হলেও সত্যি—এখানে একটু বলে রাখি।

ঠাকুর-সিংহের ছিল প্রকাণ্ড একখানা জায়গীরদারী। নামটা না হয় না-ই ফাঁস করে দিলাম, কারণ তিনি এ নিয়ে অনেক লড়াই করেছেন। অবশ্য বিশ শতকের হাতিয়াবহীন লড়াই। ভেবে দেখুন—সেই পূর্বপুরুষের সময় থেকে ভোগ করা জায়গীর। যার জন্যে বছরের পর বছর পনের জন ঘোড়সোয়ার মজুত রাখতে হত তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং তাঁকে নিজেকেও। যখনই দরবারের হুকুম হবে, অমনি লড়াই করবার জন্য ছুটে আসতে হত। ভূঁইয়া-তন্ত্র অর্থাৎ ফিউডালিজমের মজাই হচ্ছে এখানে। রাজা দিচ্ছেন জমি, নিজের রাজত্ব যাতে বজায় থাকে সেজন্য। যে পাচ্ছে তাকে সব সময় জমির বদলে দিতে হবে "জান"—যখনই দরকার পড়বে। নিজেদের জায়গীরের মধ্যে চুরি বা জুলুম করতে পারবে না, ব্যবসাদার ও বিদেশীদের রক্ষা করতে হবে। যত বড় জায়গীর সে অনুসারে লড়াইয়ের সময় দিতে হবে সিপাই। যদি লড়াই কখনও না-ই হল ত' প্রাণের খাজনাটা আর দিতে হল না। কিন্তু সিপাই মজুত ঠিকই রাখতে হবে। দরবারও ভূঁইয়াদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাবেন, আর বিপদে-

আপদে রক্ষা করবেন। ঠিক যেমনভাবে ভুঁইয়াদের কাছে দরবার আশা করেন যে, তারা নিজের প্রজাদের মান রেখে রক্ষা করবেন।

এ হেন কর্তব্য ঠাকুর সাহেবের বাপ পিতামহরা ঠিকই করে যাচ্ছিলেন। তবে এই বিনিময়ের বন্দোবস্তে এ যুগে জায়গীরদারদের বেশ সুবিধাই হচ্ছিল। ব্রিটিশ শান্তি অর্থাৎ প্যাক্স ব্রিটানিকার দৌলতে নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি ত' আর ছিল না। কাজেই জায়গীরদাররা তোফা আরামেই ছিলেন। বেশী আরামে মাথাটা শূন্য হয়ে থাকলে, আবার নাকি তাতে ভূতও ঢুকে পড়ে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ঠাকুর সাহেব বলেছিলেন এ কথা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছিলাম আমিও। বেপরোয়া ভাবে দুরন্ত জীবন উপভোগ করার বাসনাকে ঠাকুর সাহেব ভূত মনে করেছেন। কিন্তু হায়, এই সাদামাঠা চার দিকে গণ্ডী কাটা সুশীল সুবোধ বাঙালী জীবনে একটি বার সেই ভূতের নৃত্য যদি ঘটে ওঠে ত' মন্দ হয় না। খেটে খেটেই ত' দিনগুলো কাটল। পরান বঁধুরে—বলে হেঁকে পায়ের উপর পা তুলে বসব, আরামের ভূতটাকে একটু পেয়ার করে নেড়ে-চেড়ে দেখব তার ফুর্সৎই মিলল না।

যাক সে নসীবের কথা! ঠাকুর সাহেব এদিকে বিপদে পড়লেন। পাশের জায়গীরদারের সঙ্গে জায়গীরের মালিকানা নিয়ে বাধল মামলা। তুমুল সে মামলা—একেবারে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরই হার হল। এবার তিনি কি করবেন, আন্দাজ করতে পারেন?

ভেবে দেখুন "কথা ও কাহিনী"র সেই চমৎকার কবিতাটি। চিতোরের রাণা কুম্ভ হারা (হর) বংশের বুঁদির রাজার কাছে মার খেয়ে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, "বুঁদির কেল্লা যতক্ষণ মাটির উপর থাকবে, ততক্ষণ আর তিনি জলস্পর্শ করবেন না"। এ দিকে বুঁদি যে কি চিজ, তার বিলক্ষণ প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। তাকে হজম করা তাঁর কর্ম নয়। অথচ প্রতিজ্ঞাটাও করে ফেলেছেন। আমাদের গলির মোড়ে পায়ে চলার রাস্তার কোণে মাটি খুঁড়ে গাবু্বু বানিয়ে তাতে পাথরের গুলী বসিয়ে অন্য খেলুড়েদের যে রকমভাবে দিব্যি দিই—"নট নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু", একেবারে ঠিক তাই। মুরদ নেই, কিন্তু দিব্যি দিয়ে ভাতের উপর রাগ করে বসে রইলেন রাণা।

শেষ পর্যন্ত সর্দাররা নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মত একটা ব্যবস্থা বাতলালেন। রাতারাতি তৈরী হয়ে গেল নকল বুঁদি-গড়। ছুটে

এলেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাণা কুম্ভ। এবার বুঁদির-গড় আর মাটির উপর মাথা তুলে থাকতে পারবে না।

কিন্তু রাণারই আশ্রিত এক সামন্ত, বুঁদির হরবংশের বীর, শিকার থেকে ফিরে আসবার সময় ব্যাপারটা এক চোখ দেখেই বুঝে নিল। বুঁদির এত বড় অপমান! কখনো নয়, কখনো নয়। একজন হরবংশীও বেঁচে থাকতে কখনো নয়।

মহাবীর একা ধনুকবাণ নিয়ে রাণার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে লেগে গেলেন। কানেও তুললেন না তাদের শাসানি আর চোখরাঙানি। প্রাণ দিয়ে বংশের মান রেখে গেলেন। বিনা রক্তপাতে নকল বুঁদি-গড়ও রাণা মাটিতে লুটিয়ে দিতে পারলেন না!

এ হেন লম্বা পাগড়ীর ঝুলওয়ালা হচ্ছেন আমাদের ঠাকুর সাহেব। তিনি আজ প্যাক্স ব্রিটানিকার যুগে খুশি মত তরোয়াল চালানো আর প্রাণ নেওয়া-নেয়ির কারবার নেই বলেই কি, বিনা লড়াইয়ে জায়গীরখানা শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারেন? মামলায় না হয় হারই হয়েছে। কিন্তু বীরধর্ম ত' একটা আছে?

এ দিকে যে জায়গীরদার মামলা জিতেছেন, তিনিও একই দরবারের জায়গীরদার। তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করাও যে স্বামিধর্মে বাধে। কি করেন এখন ঠাকুর সাহেব?

হায়! জোর যার জমিন তার, সত্যযুগের এই সাধু নিয়মটা বাতিল হয়ে গেছে এই ঘোর কলিযুগে। এমন কি দরবারে ভাল করে ভেট আর সেলামী দিয়েই যে কাজ হাসিল করে নেওয়া যাবে, সে পথও বন্ধ। দুষ্ট লোকেরা সে জিনিসটাকে "ঘুষ" এই বদনাম দিয়ে রেখেছে। তার উপর আবার সাগরপারের প্রিভি কাউন্সিল একেবারেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইংরেজরা আবার সেলাম আর সেলামী কোনটাতেই হুকুমের নড়চড় করে না, এমন একটা অখ্যাতিও আছে।

কিন্তু এই শ্রদ্ধাহীন বেয়াড়া চালের ঠাট্টা মস্করা ছেড়ে দিন মশায়! এদিকে আমাদের ঠাকুর সাহেবের যে ধনও যায়, মানও যায়। সেই সেকালের কথায় কথায় লড়াইয়ের ফ্যাসানটা বজায় থাকলে প্রাণটা না হয় দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু হায়, আদর্শের পথ থেকে নেমে এসেছে এই হৃদয়হীন বৈশ্যযুগ। তাই সে পথটাও খোলা নেই।

অথচ বংশের সম্মান যে কত বড় জিনিস, তা আমরা যারা থোড়-বড়ি-খাড়া

যোগাড় করতেই প্রাণান্ত হচ্ছি দিনকে দিন, সেই আমরা বুঝব কি করে? বুঝেছিলাম শুধু তখন, যখন ঠাকুর সাহেব অন্টালা কেল্লা দখলের কাহিনী আমায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের পূর্বপুরুষের বাহাদুরীর একটা সত্যি গল্প করছেন। অবশ্য যে দুই বড় সামন্ত বংশ এই গল্পের নায়ক তিনি তাঁদের কোন্ বংশের লোক, তা ফাঁস করলেন না না আম'র কাছে।

জাহাঙ্গীর চিতোর দখল করে রাণাকে ত' মেবারের পাহাড়ে জঙ্গলে ভাগিয়ে দিলেন। কিন্তু তা বলে রাণার সামন্তদের বীরত্ব ত' আর কমে যায়নি! না কমে গিয়েছিল তাদের বংশের সম্মান রক্ষার দিকে কড়া নজর। তাই হঠাৎ যখন অন্টালা কেল্লা ফিরে দখল করবার সুবিধা এসে গেল, তখন কোন্ বংশ সৈন্যদের আগে আগে লড়তে যাবে তা নিয়ে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। মহারাণা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। সমতল দেশটুকুর প্রান্তে এই দারুণ শক্তভাবে পাথরে-গড়া পাহাড়ী কেল্লাটা আচমকা আক্রমণ করে দখল করতে হবে। কেল্লার "পোল" অর্থাৎ ফটক মোটে একটি—তার গায়ে বড় বড় লোহার কাঁটা বসান। হাতীর শক্ত চামড়া পর্যন্ত ফুঁড়ে যাবে তাতে। কাজেই হাতীর চাপ দিয়ে সে ফটক ভেঙে বা খুলে ফেলা সম্ভব নয়।

চন্দাবৎ গোত্র বরাবর মেবারের সৈন্যদলের সামনে থেকে লড়াই করে এসেছে এ পর্যন্ত। এটা তাদের পাওনা সম্মান। সবার আগে মরতে পারার অধিকার।

কিন্তু শক্তাবৎ গোত্রও ত' ফেলনা নয়! হালের বহু লড়াইয়ে তাদের হাতিয়ারের হিম্মৎ নতুন এক হক তৈরী করে নিয়েছে। তার উপর এই কেল্লাটা তাদেরই এলাকায় ছিল। কাজেই চন্দাবৎরা প্রথম মরতে পাবে কিসের অধিকারে?

লেগে যায় আর কি নিজেদের মধ্যে এখনি।

পুরোনো কলকাতায় এঁদো গলিতে ততোধিক পচা বীরত্বের অভিনয় আমরা করে থাকি। বড় রাস্তার মোড়ে গুণ্ডা দাঁড়িয়ে থাকলে, গলির মোড়ে নিরাপদ দূরত্বে কে আগে দাঁড়াবে, সে নিয়ে মারামারি নেহাত কম হয় না। কিন্তু এ যে বড় রাস্তায় আগে এগিয়ে এসে মার খাওয়া। ফাঁকিঝুঁকির পথ নেই একেবারে।

বুদ্ধিমান রাণা বললেন—যে গোত্র আগে অণ্টালায় ঢুকতে পারবে, সামনে এগিয়ে লড়বার অধিকার হবে তাবই।

অণ্টালা চলো। চলো অণ্টালা!

শেষ রাতে রওনা হল দু' দল। একই সময়ে। এত দিন তারা পাল্লা দিয়ে এসেছে। কিন্তু কারা বড় বীর তার ফয়সালা হয়ে যাবে চূড়ান্ত ভাবে। সামনে শত্রু—দুর্ভেদ্য পাহাড়ী কেল্লার মধ্যে। পিছনে, পাহাড়ের ওপারে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে স্ত্রী পরিবার। বীরদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাদের চারণ দল। গাইছে তাদের গোত্রের পূর্বপুরুষদের বীরগাথা। যোগাচ্ছে নতুন বীরত্বের প্রেরণা।—

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

শক্তাবৎরা সোজা চলে এল দুর্গের দরজায়। ভোর তখনো হয়নি, শত্রু তখনো তৈরী নয়। কিন্তু দেওয়ালে তারা দাঁড়িয়ে গেলো সারি সারি। শুরু হল তুমুল লড়াই।

চন্দাবৎরা এ এলাকায় বিদেশী। কাজেই পথ ঘাট ঠিক মত জানা নেই। জলাভূমি পার হয়ে তারা পেঁছাল একটু দেরিতে। কিন্তু বুদ্ধি করে সঙ্গে এনেছিল দড়ির মই। চন্দাবৎ সর্দার চট করে উঠে পড়লেন দেওয়ালের মাথায়, কিন্তু গোলার ঘায়ে তাঁর নিজের মাথা ফিরে এল দলের মাঝখানে। মেবারের সৈন্যদলের সবার সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে যাওয়া তাঁর কপালে হল না।

দু' দলই বাধা পেয়ে গেল।

শক্তাবৎ সর্দারের সঙ্গে ছিল হাতী। কিন্তু ফটকের গায়ের লোহার কাঁটা বার বার হাতীকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। সূচের মত ধারাল কাঁটাতে হাতীর চামড়া ফুঁড়ে যাচ্ছিল। চার দিকে গাছের পাতার মত ঝরে পড়তে লাগল শক্তাবৎদের মৃতদেহ। ওদিকে চন্দাবৎদের তুমুল চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ওটা কি ওদেরই জয়ধ্বনি?

আর ত' দেরি করা চলে না। শেষে কি চন্দাবৎরাই জিতে যাবে? তাদেরই থেকে যাবে সবার আগে মরতে এগিয়ে যাবার অধিকার? নেমে এলেন শক্তাবৎ সর্দার হাতীর পিঠ থেকে। দাঁড়ালেন পিঠ পেতে কেল্লার কপাটের লোহার কাঁটাতে। করলেন হুকুম মাহুতকে বুকের উপর দিয়ে হাতীকে ঠেলে দিতে। এবার আর হাতীর গায়ে কাঁটা বিঁধল না। শক্তাবতের দেহই কাঁটাগুলিকে

ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কপাট আর কাঁটায় গাঁথা শক্তাবৎ সামন্তের দেহ ঢুকে পড়ল অন্টালায়।

আর এ দিকে ততক্ষণে?

এ দিকে ততক্ষণে চন্দাবৎ সর্দারের মৃতদেহ অন্টালায় ঢুকে পড়েছে। শক্তাবৎ সর্দার সেই জয়ধ্বনিই শুনে কপাটের কাঁটাগুলিতে দেহ পেতে দিয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের গোলার ঘায়ে চন্দাবৎ সর্দারের দেহ কেল্লার দেওয়াল থেকে বাইরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরের নায়ক পাগড়ী দিয়ে সর্দারের দেহ বেঁধে নিলেন নিজের পিঠে। উঠলেন মই বেয়ে দেওয়ালের মাথায়। বর্শা দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন নিজের পথ। তার পর ঝাঁপিয়ে পড়লেন পিঠে বাঁধা শব নিয়ে কেল্লার মাটিতে। মুখে তাঁর জয়ধ্বনি। চন্দাবতের জয়। জয় চন্দাবৎ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট মড় মড় করে ভেঙে পরে শক্তাবতের দেহ ঢুকিয়ে নিল কেল্লাতে। কিন্তু ততক্ষণে চন্দাবতের সামনে দাঁড়ানর অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

নিজের মান বজায় রাখবার জন্য যারা এমনি করে প্রাণ উজাড় করে দিত, সেই রাজপুত হয়ে ঠাকুর সাহেব এখন কি করেন?

সেই রূপকথার যুগের সহজ বিচারের পথ আর খোলা নেই। অসির বদলে রসনা যত দূর লড়াই করতে পারে, তাতে তাঁর হার হয়ে গেছে। লড়াইয়ে হেরে গিয়ে সে হার মেনে নিতে পারাও বীরধর্ম। তাই অপর পক্ষ—এ যুগে শত্রুপক্ষ বললে বেমানান হবে—তার জায়গীরের মাটিতে পা ফেলবার আগেই তিনি নিজে রাতারাতি স্ত্রী পুত্র পরিবার পাগড়ী আর তলোয়ারখানা নিয়ে জায়গীর ছেড়ে উদয়পুর শহরে চলে এলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সংক্ষেপে আমায় বলেছিলেন—কি করব আর? নিজের জায়গীরে থেকে আমি ওদের সেখানকার মাটিতে পা ফেলতে দিতাম না। তরোয়াল দিয়ে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করতাম। তাই ছেড়েই চলে এলাম আগে ভাগে।

সেই ঠাকুর সাহেব মোটরের সামনে তুলেধরা ডাণ্ডা দেখে মাথা হেলিয়ে নেমে এলেন মোটর থেকে। অবশ্য খালি হাতে। কিন্তু তরোয়ালের স্বপ্ন এখনো তিনি দেখে থাকেন।

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম মোটর থেকে। দেখি ব্যাপারটা কি।

সবাই নেমে পড়ল। মায় আমাদের বালিকা কন্যা অনুরাধা পর্যন্ত। নিশ্চয়ই খুব মজার একটা কিছু হবে।

ভীল মেয়েরা ততক্ষণে ডান্ডা মোটরের সামনের কাঁচ থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের মাথার উপর ঘুরোতে শুরু করেছে। ওদের উদ্দেশ্য সাধুই ছিল। ঘুরছে রঙঝারীতে ছোপান পরনের ঘাগরা, লেহঙ্গা, গেরোঁ সাজ। পায়ে বাজতে শুরু করেছে পাঞ্জের, অর্থাৎ পায়জোর। রুপোর, না হয় রুপালী ঘুঙুর। বাজছে মিঠে রুপালী সুরে।

গাইছে ওরা সোনালী আবেশে লুহর্ অর্থাৎ ডান্ডা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেহাতী আওরতের গান—

ঘুম্‌রে রমোবা মেজাসা
ঘুম্‌রেছে নখরালি,
নখরালি যাদ্‌গারি সা
ঘুম্‌রে রমোবা মেজাসা।

খুশিতে সবাই একসঙ্গে নাচছে, সেজে-গুজে নাচছে। ওগো, যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করে দিয়ে নাচছে। খুশিতে সবাই একসঙ্গে নাচছে।

ওদের ঘুরে-ঘুরে নেচে যাওয়া দেখে, ফুলন্ত কেশোলা গাছগুলিতেও যেন নাচন শুরু হ'ল। টুপ টাপ করে এদিক সেদিক থেকে মহুয়া ফুল ঝরে পড়তে লাগল। ভীলনীদের নাচে সাড়া দিয়ে জেগে উঠল ভীলোয়ারার অন্তর।

আমরাও দিলাম সাড়া, মন থেকে।

গত ক'দিন থেকেই লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ থেকে পেশোলা হ্রদে জলের খেলা দেখতে দেখতে হোলির খেলা দেখানর জন্য অনুরোধ করেছি শ্রীরামগোপালজীকে। তিনি এই প্রস্তাবে তেমন উৎসাহ দেননি। শেষ পর্যন্ত একবার মৃদুস্বরে এ কথাও বলেছিলেন যে, ওসব দেখে আর কি হবে? এদেশে হোলিতে যা হয়, তার একটা সাফা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মাজাঘষা নমুনা ত' কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলেই দেখে থাকবেন। কাদা আর রঙ-গোলা নোংরা জলের খেলা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে তিনি প্রথম থেকেই আমল দেননি। এর পর যখন হোলির গান শুনতে চাইলাম, তখনো তিনি আমার উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢেলেছিলেন।

শ্রীরামগোপালজী অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁর বিচারবুদ্ধিতে নির্ভর করতেন স্বয়ং মেবারের মহারাণা। আমিও তাই করেছিলাম। কিন্তু এ যে অপরূপ সুন্দর এক হোলির গান। তার সঙ্গে মনমাতানো নাচ। শহুরে পালিশকরা লোকগুলিকে বনলক্ষ্মী আজ তাঁর ঘোমটা খুলে এ কী নাচ আর গান দেখালেন।

আমাদের অন্তরের খুশি ভাবটা উপচিয়ে উঠে ওদেরও উপর যেন ছড়িয়ে পড়ল। ওরা আরো বেশী খুশি হয়ে ডাণ্ডায় ডাণ্ডা ঠুকে ঠুকে তাল দিতে লাগল। আমাদেরও মাথা তালে তালে একটু দুলছিল না কি?

জানি না। তবে ঠাকুর সাহেবের মালব দেশ ঘেঁষা সবে খোয়া-যাওয়া পিতৃ-পুরুষের জায়গীরখানার কথা মনে পড়ল। তিনি ওদের প্রথমেই একটা মালবিকা মেয়েদের প্রিয়মিলনের গান করতে বললেন।

নববর্ষের প্রথম ন'দিন ধরে রাজোয়ারাতে গৌরী দেবীর পুজো আর উৎসব হয়। বাংলা দেশে আমরা যেমন শারদীয়া পুজোর সময় প্রবাসী প্রিয়জনের ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকি, রাজপুতরাও গাঙ্গোর পুজোর সময় ঠিক তেমনভাবেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুধু শরৎ আর বসন্তে প্রকৃতির আর মানুষের মনের যেটুকু তফাত থাকে, সেটুকুর আলাদা ছায়া এসে পড়ে। গানে গানে মালবিকারা প্রিয়কে আবাহন করে—"মাতাল-করা বসন্ত ঋতু এসেছে। গাঙ্গোরের নিত্য রঙীন উৎসব এসেছে। হৃদয় আমার উতলা হয়ে উঠেছে। শরীরে ভরে উঠেছে গোলাপের সৌন্দর্য আর যৌবন। হে প্রিষ রসিক, তুমি ত' প্রবাসে অনেক উপায় করেছ, এখন ঘরে ফিরে এসো। দিল্লীর দুয়ারে নহবৎ বাজছে, এখন তুমি ফিরে এসো।"

নেচে নেচে রাজপুতানীরা গ্রামে-গ্রামে গায়ঃ

হামারা প্যারা আজ তো
গুলাবী গাঙ্গোর ছে।
জোড়ী রা প্যারা আজ তো
বসন্তী গাঙ্গোর ছে।
হামারা প্যারা রাজা।

এমন আনন্দের সময় যদি স্বামী বাইরে বিদেশে যেতে চায়, তা হলে ভীল গ্রামবধূ কি গান গেয়ে তাকে বরণ করলে, তা-ও শোনাল ভীলনীরা।

মহ্‌রা মাথা নৈ মহিমদ ল্যাব।
মহ্‌রা হেজা মারু ইহাং হো রেবো জী।

ইহাং হো রহো উতজা স্নরজ
ইহাং হো রেবো জী।

আমার মাথার দিব্যি রইল; ওগো তুমি এখানেই থাক।

একেবারে বাংলা দেশের হৃদয়-নিংড়ানো কথা।

নতুন বিয়ের ক'নে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। মন যেতে চায় হয়ত, কিন্তু চরণ চলতে চায় না। চরণে ন্পুর বাজিয়ে নেচে নেচে ভীলনীরা গাইলঃ—

মাতা বাইসে' মিলোয়া
দি রে হাতিলা বানরো।

ওগো একটুখানি দাঁড়াও আমি মায়ের কাছে একটু বিদায় নিয়ে নিই।

হাওয়া একটু ভারী হয়ে আসছে দেখে, ঠাকুর সাহেব ওদের একটা বসন্ত পঞ্চমীর গান ধরতে বললেন। মালব দেশের কিশোরী মালবিকারা পানিয়াভরণে চম্বেলি অর্থাৎ চামেলী নদীর পারে যায়। গাগরী দোলে মাথায় আর পায়জোর নাচে পায়। নতুন ঋতুকে ওরা আবাহন করে গানে গানে, নতুন পাতা ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। গায় তারা প্রেমের গান, স্বপ্ন দেখে তারা প্রেমের আর রূপরাগের। ভরা থাকে, ভরা থাকে 'গাগরমে সাগর'।

ফুলে ফুলে লাল মহুয়া শাখার তলায় বসে শুনলাম এক নতুন বৌয়ের গান। বেচারীর স্বামী আগেই লুকিয়ে আর একটা বিয়ে করে রেখেছিল।

কৈসে' জ্বাব করু' রসিয়াসে'।
ডাল রে বাদল বিচ চমকে তারে'।
সাঁজ পরে পিন লাগে' প্যারো।
জোর করুঙ্গি জ্বাব করুঙ্গি
তো রসিয়ারা মেলামে' রীজা রহুঙ্গি,
কৈসে' জ্বাব করু' রসিয়াসে'।

প্রিয়তমের কাছে আমি কেমন করে নালিশ করব, ওগো! সে যে মেঘদলের মাঝখানে তারার মত। সন্ধ্যায় তাকে আরো বেশী মিষ্টি দেখায়। আমি যদি নালিশ করি আর তর্ক করি, তা হলে তার সঙ্গে আমার জীবন সুখে কাটাব কেমন করে? ওগো, প্রিয়তমের কাছে আমি নালিশ করি কেমন করে?

রসিয়া, রসিয়া, ওগো রসিয়া। মাজাঘষা সংস্কৃত কাব্যের বিরহবিধুরা

যক্ষপত্নীর প্রেমবিহ্বলতা নয়। এই ছোট্ট কথাটুকুর মিঠে রেশ সমস্তটা দেহ-মন-আত্মাকে প্রেমের রসে বিহ্বল করে তুলল।

কালিদাসের উজ্জয়িনী কি আজ ফুটে উঠল রঙ-ঝরানো মহুয়াতলায়? হয়ত তার যুগেও কোন প্রেমবিহ্বলা নায়িকার মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠত এমন করুণ আন্তরিকতা ভরা আপনঢালা গান। সুসভ্য সংস্কৃত কাব্যের শত মুগ্ধা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকার ছবি আমার এই উজ্জয়িনীর বাইরের পল্লীবালার গান শুনে নতুন রূপ ধরে এল! এরই আপনভোলা আপনঢালা প্রেমের জন্য মরুভূতির মত মন তৃষিত হয়েছিল এতদিন।

এবার শুনতে চাইলাম পুরুষদের হোলির গান। আমরা শহুরে সভ্য জীবনে একালে পুরুষদের গান প্রায় ভুলে গেছি। মেয়েরা গান শেখে বিয়ের জন্য। কখনো বা তাতে সংসার চালাবার সুবিধাও হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে ঘরে ছেলেরা সাধারণ দিনগুলিকে ভরে তুলবার গান শিখবে কিসের তাড়ায়?

তবু ভাবলাম যে, এই বন্য অঞ্চলে ছেলেরাও ত' পায় প্রকৃতির প্রেরণা। শুধোই ওদের পুরুষদের হোলির গানের কথা।

অমনি বেরিয়ে এল একখানা ধামাল নাচের গান। পুরুষরা রঙভরা পিচকারী নিয়ে গায়—

রঙ ঝিনো, রাঠোরাকা রঙ ঝিনো,
ভূপতো বড়ে ভারী
গড়তো বিকানো।

রাঠোররা রঙ খেলছে। রঙ খেলাচ্ছে। এত বড় বাহাদুর শানদার আদমী। বিকানীরে তার বাস। তবুও কেমন খেলছে!

পরদেশী পুরবিয়াদের দেখেই এই গানখানা বেছে বের করল কি না কে জানে? একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম। পল্লীবালাদের চঞ্চল চরণের নাচনে মনে যে চলেছে অনুরণন।

সতৃষ্ণ চোখে তাকালাম পশ্চিমের পানে। আরাবলী পাহাড়ের চূড়াগুলি পার হয়ে, মরুভূমি পার হয়ে আরেকটি সুন্দর দেশে গিয়ে নজর ঠেকল।

সে হচ্ছে ইরাণ। বুলবুল আর গোলাপ, সাকি আর সুরার দেশ। আঙুরের মত রমণীয় সাকি আর আঙুরের রস-নিংড়ান সুরার দেশ।

এমনি একটা মরুপ্রান্তরের পাশাপাশি শ্যামল স্নিগ্ধ কোণাটুকুর ছবি। সে ছবির রূপ দিয়েছেন হাফিজ তাঁর অমর লেখনীতে—

খুশি হও মোর হিয়া
প্রভাতের বায়,
ওই আসে পুলকিয়া
সে দিনের প্রায়,
পুনঃ আসে সাথে নিয়া
মিঠে বারতায়।

উটের ক্যারাভ্যান চলেছে প্রান্তর দিয়ে। তাদের গলার ঘণ্টার আওয়াজে তিনটি কিশোরী ঘুম থেকে জেগে উঠল। সেই ক্যারাভ্যানের সঙ্গে সওদা চলেছে সুগন্ধির, জহরতের, তুকতাক করে মনোহরণের বেসাতীর। কিশোরীরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পোশাক পরে নিল। পরল তারা ইরাণী মরুভূমিতে অরুণোদয়ের রঙের, গোলাপী রঙের, হাল্কা বেগুনি রঙের পোশাক। সাজিয়ে রাখল তাদের স্বপ্ন-গুলিকে ফুলের মত থরে থরে, বেসাতী যাত্রার পথে মনে মনে ছড়িয়ে দেবে বলে। ওরাও ওই পথেই চলে যাবে। সব চেয়ে বড় কিশোরীটি প্রেমে পড়ার জন্য যেন তৈরী হয়েই ছিল। ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ তার মনে প্রেমের আহ্বান এনে দিল। সেই আহ্বানে সে অন্য দুটি কিশোরীকেও সাড়া দিতে শেখাল।

ওগো সাথী, মম সাথী,
আমি সেই পথে যাব সাথে।

কিন্তু ওরা যে বিয়ের জন্য বাগ্‌দত্তা। গ্রামেরই ছেলেদের কাছে। তারা এসে ওদের হাত ধরে বাধা দিল, জানতে চাইল কেন ওরা চলে যেতে চাচ্ছে? কোথায় যেতে চাচ্ছে?

কিন্তু কি উত্তর দেবে ওরা? দিগন্তের ওপারে যে বিশ্ব, ঘণ্টার টুংটাঙের মধ্যে যে বাণী, তার মর্ম ওরা বোঝাবে কি করে এই বিয়ের জন্য তাকিয়ে থাকা রেগেওঠা তরুণদের? শেষে ওরা নাচতে নাচতে তাদের রাগ জল করে দিল। নাচের মোহে, যাদুমন্ত্রে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারা যখন আবার জেগে উঠল, তখন ওরা চলে গেছে। চলে গেছে মোহনিয়ার ডাক অনুসরণ করে। আর ওরা ফিরবে না। ফিরবে না ওই মরুপারের গাঁয়ে।

ইরাণী মরুপ্রান্তরের প্রেমবিহ্বলা এই কিশোরীরা যেন তাদের হাসির আর নাচের ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠা ঢেউয়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে মিলিয়ে গেল।

তাদের আর দেখতে পেলাম না। তাদের সেই ব্যাকুলকরা রঙ ঝরানো পোশাক-গুলি পর্যন্ত না।

কবি সাদী ত' ঠিকই লিখেছিলেন—

> ওগো ক্যারাভ্যান, ধীরে চল ধীরে, মনের শান্তি যায়;
> আমার ছিল যে হিয়াখানি তারে মনচোর লয়ে যায়।
> পণ্ডিত জনা দেহে আর হিয়ে পৃথক্ করিতে চাহে না;
> আপন আঁখিতে আমি যে হেরেছি, হিয়া আর মোর রহে না।

সত্যিই, হিয়া আর মোর রহে না।

ব্যাকুল হয়ে পল্লীবধূদের কাছে আরো নিবিড়ভাবে আপনাদের, আরো পুরোপুরি খাঁটি দেহাতী গান শুনতে চাইলাম। বললাম—এমন গান শোনাও যা শুধু তোমরাই গেয়ে থাকো এই মরুভূমির পারে শ্যামল বন-প্রান্তরে—যা গাওয়া হয় না সভ্যতার পালিশকরা শহুরে বৈঠকে।

ওদিকে তাকিয়ে দেখি, ঠাকুর সাহেব প্রাণপণে ইশারা করে কি যেন বলতে চাচ্ছেন। মুখের চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন কিছু একটা বারণ করতে চাইছেন, কিন্তু চোখের চেহারায় সেটা মালুম হল না।

শেষ পর্যন্ত তিনি রামগোপালজীর নামটা শুধু বললেন।

জানি, রামগোপালজী কি রকম গান আর কবিতা এই রাজধানী দিল্লী শহর থেকে আসা লোকগুলির জন্য ফরমাস দেবেন। তিনি চারণদের মুখে আমায় শুনিয়েছিলেন দুঃসাহসী রাঠোর বীর মাড়োয়ারের রাজা যশোবন্ত সিংহের লেখা কবিতা।

> মুখ শশি বা শশি সোঁ অধিক
> উদিত জ্যোতি দিনরাতি।
> সাগর তে উপজি নয়হ
> কমলা পর তা সোহাতি।
> নৈন কমল য়ে এন হৈ, ঔর কমল কেঁহি কাম
> গমন করত নৌকী লগৈ, কনকলতা য়হ বাম।

মাথা নেড়ে বলেছিলাম—সাধু, সাধু। আওরঙ্গজেব এ'র ভয়ে সর্বদা অস্থির থাকতেন, আর শেষ পর্যন্ত আফগানদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্য কাবুলে পাঠিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হন। অনেকের বিশ্বাস, দিল্লীশ্বর সেখানে বিষ খাইয়ে এই মরুভূমির

কাঁটাকে উপড়িয়ে ফেলেন। সেই বীরের কবিতা আমায় মুগ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু এই কবিতা আর সমসাময়িক পুরানো বাংলা কবিতায় ভাব আর ভাষায় খুব বেশী তফাৎ নেই। তা ছাড়া এই কবিতা ত' দিল্লীতে বসেও উপভোগ করতে পারতাম। তাই তার চেয়ে দিন নতুন কোন জিনিস।

তখন বের হ'ল ভারী সুন্দর আর একটি কবিতার ডুয়েট।

বিকানীরের রাজার ভাই পৃথ্বীরাজ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে মোগল দরবারে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বীরত্বে আর কাব্যপ্রতিভায় তাঁর জুড়ি তখন আর কেহ ছিল না। তিনিই আকবরের সভা থেকে মেবারের মহারাণা প্রতাপকে এমন একখানি কবিতা লিখে পাঠান, যা পেয়ে মহারাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করে নতুন উৎসাহে যুদ্ধে নামেন ও মেবার আবার জিতে নেন।

এহেন বীর কবি পৃথিবরাজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক বয়সে আবার বিয়ে করেন। কথাতেই আছে, 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্'। কিন্তু এই বিষকে কবি 'প্রিয়শিষ্যা ললিতা কলাবিধৌ' করে নিয়ে অমৃত বানিয়ে নিলেন। যশলমীরের রাওল-কন্যা চম্পাদেবী আর তাঁর স্বামী পৃথ্বীরাজের একটি ডুয়েট কবিতা ডিংগল ভাষার অমর কাব্য 'রূপমণি-মঙ্গল' থেকে রামগোপালজী আমায় শুনিয়ে দিলেন।

পৃথ্বীরাজ দাড়ি থেকে একটা ধোলা অর্থাৎ সাদা চুল উপড়িয়ে ফেলে দিচ্ছেন। তরুণী স্ত্রীর যেন নজরে না পড়ে। কিন্তু পিছন থেকে তা দেখতে পেয়ে চম্পা হাসতে শুরু করলেন। আয়নাতে চম্পার মুখে হাসি দেখে পৃথ্বীরাজ বললেন ঃ—

পীথল ধোলা আবিয়াঁ; বহুলো লাগি খোড়।
পুরে জীবন পদ্মিনী, উভী স'হ মরোড়॥
পীথল পলী ঠমুক্কিয়াঁ, বহুলী লগ গই মোড়।
স্বামিনী হাঁসা করে, তালী দে মুখ মোড়॥

এমন রসাল অথচ ব্যথায় ভরা কবিতা শুনে, স্বামী পীথল অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের মনের গ্লানি মেটাবার জন্য চম্পা সংগে সংগে কবিতা রচনা করে উত্তর দিলেন ঃ—

প্যারী কহে পীথল শুনো,
ধোলাং দিস মত জোয়।

নরাং নাহরাং ডিগমিরাং
পাকাং হো রস হোয়॥
খেড়জ পক্কা ধোরিয়াং, পম্থজ গ উধাং পাব।
নরাং তুরংগাং বনফলাং পক্কাং পক্কাং সাব॥

ভরাযৌবনা পদ্মিনী স্ত্রী স্বামীকে পাকা চুল উপড়াতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। মুখ ফিরিয়ে হাতে তালি দিচ্ছে। স্বামীর মুখে সে সম্বন্ধে কবিতা শুনে স্ত্রী উত্তর দিচ্ছে যে, শোন শোন, প্রিয়ার কথা শোন। মানুষ, সিংহ আর দিগম্বর অর্থাৎ সন্ন্যাসী পাকা অর্থাৎ পরিপূর্ণ হলেই রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আর কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কবিতা রচনায় শিষ্যা করে এমন পুরস্কার পেয়েছেন কি না জানি না।

কিন্তু কোথায় এখন রামগোপালজী আর তাঁর সুসভ্য কাব্যসুধা? আমি যে ভীলোয়ারার অন্তরে বসে কাব্য আর গীতে সুরার মত রস পেয়ে গেছি। তাই শুনতে চাইলাম, ওদের একেবারে নিজস্ব গোপন কথার গানগুলি।

এবার ভীলনীরা চোখে হানল লক্ষ বিদ্যুতের ঝিলিক। হাসি মুখগুলি ঢেকে নিল রঙীন ঘোমটার আড়ালে। মাটিতে পাজের-পরা পা-গুলি তাল ঠুকে জানিয়ে দিল যে, মনের মতন কিছু একটার জন্য এবার তৈরী হচ্ছে ওরা।

ওই আধো সভ্য আধো বসনে ঢাকা কোকিলরা প্রাণ ঢেলে গলা পঞ্চমে তুলে কি যেন গাইল। কোন পাওয়া না পাওয়ার বেদনায় রাঙানো অনুরাগের গান। কেমন না জানি সে অনুরাগ—যা এই হোলির খেলায়, এই প্রাণের মেলায় এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বনে বনে। যে ময়ূর আর হরিণগুলি আপন খেয়াল-খুশিতে ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখে যাচ্ছিল, তারাও যে হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! ওরাও যেন কান পেতে শুনতে লাগল, এই ভীলনীদের হোলির গান। পৃথিবীতে আর কোন গান শুনতে কি কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে ময়ূর আর হরিণ? এই বিশ শতকে? এই আণবিক বোমার বাজারে?

কি সে গানের কথাগুলি? যদি দেখা পেতাম, হোমারকে মিনতি করতাম সে গানের আবেগকে ভাষায় ফোটাতে, কালিদাসকে অনুনয় করতাম সে ঝঙ্কারকে রূপ দিতে। সে গানের কথাগুলি কি?

ভীলনীদের প্রিয়তমদের দেহে হোলির দিনের ফাগের রঙ এসে পড়েছে। প্রিয়ারাই সে রঙ ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কে যে কার গায়ে রঙ ছুড়েছিল

তা কেউ স্বীকার করছে না। এদিকে ওদের গায়ে আগুনরাঙা ফাগের স্পর্শে সত্যি সত্যিই আগুন লেগে গিয়েছে। সারা গায়ে সর্ব ইন্দ্রিয়ে। এ আগুন নেভাবে কি দিয়ে? দাউ-দাউ করে জ্বলছে যে আগুন!

তার পর কি হল?

নাঃ। সে আগুনের আঁচ আমার এ কলমে সইবার ক্ষমতা নেই। মাপ চাইছি।

॥ ৮ ॥

শেরীর গ্লাস এগিয়ে দিলেন সেই ফরাসী ভদ্রলোকটি। জয়পুর মহারাজের গেস্ট হাউসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও বেশ ভাব হয়েছিল।

রাজস্থানে এসে রাজপুত পরিবেশের মধ্যে একে বিশ শতকের প্রতি সন্ধ্যার সামান্য শেরী বললে রাজোয়ারার অমর্যাদা করা হবে। মনে করতে হবে, এ হচ্ছে কোন সোয়াই রাজার আদর করে দেওয়া মনোয়ার পিয়ালা—অর্থাৎ আমন্ত্রণ পাত্র।

অবশ্য আরকের বদলে শেরী।

হায়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণটা যখন তখন দিয়ে ফেলার দিন আর নেই তাই সন্ধ্যার শান্তিবারি শেরীই আজকাল যথেষ্ট মনে করতে হবে।

কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে তা ফেরত দিলাম। বললাম যে মর‍্যালিস্টরা যে কারণে 'কারণ' করেন না সে জন্য নয়। ও রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ। তবে আপনি নিশ্চয়ই পান করুন। কারণ বন্ধুরা 'সামাজিক মাত্রায়' পানানন্দ করলে আমার আপত্তি নেই আর তাদেব খুশী দেখলে নিজেও খুব খুশী হই।

ভদ্রলোকের চোখে দুষ্টামির হাসি ও মুখে রঙ্গরসের আভা। বললেন,—রোমে এসে রোম্যানদের মত চলতে হয়।

হেসে উত্তর দিলাম,—সেটা হচ্ছে শুধু রোমে। তবে কথা দিচ্ছি যে, প্যারিসে এসে ঠিক আপনার মত চলতে চেষ্টা করব।

উত্তর পেতে দেরি হল না। বেশ ত' তাহলে রাজপুতানায় একটু আফিম দিয়ে শুরু করুন।

আলোচনাটা জমে উঠল।

বাবর হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন তুর্কী এবং মোগলের অত্যাচারে তাঁর পৈত্রিক রাজ্য ও সুখ শান্তি সব গিয়েছিল। সারা জীবন তাদের সঙ্গে লড়াই করে অস্থির হয়ে শেষে হিন্দু-স্থানে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন ইতিহাস পরিহাস করে তার নাম দিল মোগল সাম্রাজ্য।

সেই বাবর নিজের দেশ মধ্য এশিয়া থেকে আর কিছু না আনতে পারুন, এনেছিলেন আঙুর ও খরমুজা। এদেশে এ দু'টি এই প্রথম আমদানী হল। তাঁর প্রপৌত্র জাহাঙ্গীর আমদানী করলেন তামাক। কিন্তু আফিম যে কে এনেছিলেন তা কেউ জানে না। আফিম ছাড়া পুরাতন যুগের রাজপুত চরিত্র ও জীবন কল্পনাই করা যায় না। যারা রাজস্থানে বিদেশী অথবা ঘরভেদী বিভীষণ তারা পেছনে পেছনে বলে থাকে যে, এই আফিমের সাময়িক নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাই রাজপুত বীরত্বের বড় কারণ। এটা কিন্তু নিছক পরনিন্দার কথা। কারণ রাজপুতের বীরত্বের উৎস হচ্ছে তার হৃদয়ে আর ঐতিহ্যে। বাইরের কোন মাদকতায় নয়। তার বীরত্বের কাহিনী অন্যকে দিয়েছে মাদকতা কিন্তু মদিরায় তার জন্ম নয়। শস্য, মূল, ফল এসবের নির্যাস থেকে রাজপুতেরা আরক তৈরী করত আর আফিমের ফুল থেকে করত আফিম। মাধোয়ারা পিয়ালা অর্থাৎ মাতোয়ালা পাত্র ছিল ওদের চিরকালের সামাজিক অনুষ্ঠান। আম্‌ল্‌ অর্থাৎ আফিমের পেয়ালা এগিয়ে দিলে একই সংগে অভ্যাগতকে চা দেওয়া ও আশ্রিতকে রাখীবন্ধন দেওয়া হয়ে যেত।

বংশের কুল প্রদীপ জন্মাল—বিলাও সবাইকে আফিম। কোন খোশ খবর এল—বের কর বাড়ির সবচেয়ে বড় গামলাটা, মেশাও তার মধ্যে জলের সংগে আফিমের দলা, কাঠি দিয়ে খুব ভাল করে নাড়তে থাক যতক্ষণ না সেটা খুব ভালভাবে গলে মিশে যায়। আর পাড়ার সবাইকে বিলোবার জন্য অত কৌটো বা বাটি কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সবাই হাতে হাতে অঞ্জলি করে মন্দিরে চরণামৃতের মত আম্‌ল্‌ চাখতে থাকে। বাইরের লোক তখনি বুঝে নেবে যে, বিশেষ একটা পরব চলছে এ বাড়িতে।

আরব বেদুইনের ও রাজপুতের শপথ করা আর শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ার রীতি ঐতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত আছে। কথার জন্য মাথা দিতে ওদের তুলনা নেই পৃথিবীতে। রাজপুত যখন পাগড়ী বদল করে বা ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে অথবা এক সংগে আফিম খেয়ে কোন কথা দেয় তখন সে কথা বজায় রাখবার জন্য সে প্রাণ দেবে কিন্তু মান খোয়াবে না।

অবশ্য এ যুগে আফিমের সে দিন নেই। রাজপুতেরও সে দেমাক নেই।

এ যুগের কথায় ফিরে এলেন আমার সন্ধ্যার সংগী। তিনি নালিশ করলেন যে, ভারতবর্ষে সামাজিক মেলামেশা, ভাবের আদানপ্রদান ও সাংসারিক সৌহার্দ্যের বড় অভাব। যে দেশে ধর্ম এত উদার, এত বহু ধারায় দিকে দিকে

বয়ে যাচ্ছে, যে দেশে মানুষের মন এত কোমল, সে দেশে সমাজ এত কঠিন কেন? সংসার এত কঠোর কেন? পূজায় পার্বণে উৎসবে বারোয়ারীতে এত মেলামেশা, এত হট্টগোল। কিন্তু প্রতিদিনের প্রতি সন্ধ্যার ব্যাপারে এত কচ্ছপের মত নিজের খোলার মধ্যে লুকিয়ে থাকা কেন? এত নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকার অসামাজিকতা কেন?

আমার কিন্তু বর্তমান যুগে, হালের কালে ফিরে আসার কোন ইচ্ছা ছিল না। যা রোজ চোখের সামনে দেখছি, যা সব সময় অনুভব করছি চারদিকে, তা যে কোন সময় বিচার করা যাবে। তার যাচাই করে দেখুক ভবিষ্যৎ। অতীতকেই আমি বর্তমানে অনুভব করতে চাই। বর্তমানে—সংসারের হাত থেকে আমার দুদণ্ডের নিষ্কৃতির সময়টুকুতে।

তাই বললাম,—আমাদের অসামাজিকতার সম্বন্ধে নালিশ নতুন নয়। পাঁচ শ বছর আগে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরও সেটা লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, প্রশংসা করবার মত আরাম হিন্দুস্থানে খুব কমই আছে। এখানে বন্ধু-বান্ধবের সংগসুখের, দিলদরিয়া ভাবে মেলামেশা করার বা অন্তরংগতার আনন্দ যে কি তা লোকে জানেই না। এদের ব্যবহারে নেই ভদ্রতা, আচারে নেই সহানুভূতি, বিচারে নেই পরের মনের দিকে তাকানর কোন প্রয়োজন।

এ যুগেও বিদেশীরা আমাদের সম্বন্ধে তাই মনে করে থাকে।

সন্ধ্যার বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন. কিন্তু বাবর ত' এদেশে এসেছিলেন শত্রু হিসাবে, আক্রমণকারী হিসাবে। তিনি এদেশের লোকের মন ও সামাজিকতার কথা কি করে জানবেন অত তাড়াতাড়ি?

উত্তরটা খুব সহজ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকলে এসব বুঝতে মোটেই সময় লাগে না। বাবরের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ফতেপুর শিক্রিতে রাণা সংগের উপর জয়। মেবারের রাণার সংগে সৈন্য ও সামন্ত ছিল বাবরের চেয়ে অনেক বেশী। এই শুধু একবার রাজপুতরা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘ তৈরী করেছিল। রাণা সংগ যে সংঘ দাঁড় করিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত জোর বাবরের ছিল না। তবু সংগের হার হল। হিন্দু হেরে গেল বীরত্বের অভাবে নয়, বন্ধুত্বের অভাবে। বিশ্বাসের অভাবে।

শুধু গোলাবারুদের বিক্রমের চোটে নয়, গলাগলি করে এক প্রাণ হয়ে যুদ্ধ করার অভাবে।

ফতেপুর শিক্রির (খানোয়া গ্রামের) যুদ্ধের বর্ণনায় বাবর সঙ্গের সেনাদলের সম্বন্ধে লিখেছেন যে, সঙ্গের অশ্বারোহীদের মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ এর আগে তাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছিল। বেশীর ভাগ ছিল শৃঙ্খলাহীন লোকের দঙ্গল, যারা তাকে কোনদিন নেতা বলে স্বীকারও করেনি। রাজপুত সঙ্ঘ "সাঙ্গার" অধীনে একত্রিত হয়েছিল বটে, কিন্তু একতাবদ্ধ হয়নি। একত্র আর একতা এক জিনিস নয়।

এই যুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দিয়েছিল একজন হিন্দু রাজা। সে সময় বাবরের সেনাদল ভয়ে অসহায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল আর বাবর নানা রকম চেষ্টা করে তাদের সাহস ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করছিলেন। ঠিক সে সময়ই রাণা সঙ্গের এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু বোঝাচ্ছিলেন যে, মোগলদের আক্রমণ করার কোন দরকারই নেই। সঙ্গ তাই বাবর সন্ধি করবেন এই আশায় বসে থেকে সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছিলেন। প্রায় এক মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর বাবর যখন যুদ্ধে নামলেন তখন সন্ধির প্রস্তাবের ঘটক রাইসিনের রাজা শিল্লাদি, রাজপুত সেনার ঠিক মাঝখানে সাজান ও সামনে এগিয়ে রাখা সৈন্যদল নিযে বাবরের সঙ্গে যোগ দিল।

ভারতের ইতিহাসে জয়চাঁদ শুধু একজন নয়। বহু বহু সংখ্যায় তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজেদের অক্ষয় কালিমা স্বদেশের মুখে লেপে দিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গ আর বাবরের ব্যক্তিত্বের তুলনা করলে এই যুদ্ধের ফলাফলের কারণ তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সঙ্গ ছিলেন রাগী, অহঙ্কারী। তাঁর আধিপত্যে ছিল শৌর্য, সখ্য নয়। তিনি ছিলেন বীর, কিন্তু কারো বন্ধু নয়। তাঁর সামন্ত দলে ছিল বশ্যতা, ভালবাসা নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল প্রভাব কিন্তু প্রীতি নয়।

হিন্দুর স্বদেশপ্রেম বলতে খুব পরিষ্কার দৃঢ় ধারণা ছিল না। যুদ্ধ করতে যেত শুধু জাত ক্ষত্রিয়রা—তাও শুধু রাজার জন্য এবং ভূইয়াতন্ত্রের (feudalism) বাধ্য বাধকতার খাতিরে। সেই রাজাই যদি হন রাগী ও একরোখা, সৈন্যরা লড়বে কার জন্য? রক্ত ঢালবে কার কথায়?

অন্যদিকে একবার বাবরকে বিচার করে দেখা যাক। তাঁর অন্যান্য অস্ত্র, রণকৌশল প্রতির সুবিধা ছাড়াও বড় যে গুণটি ছিল তা প্রত্যেক নায়ক ও

সেনাপতির পক্ষে খুব বড় জিনিস। তা হচ্ছে অন্তরের টান। বন্ধুবাৎসল্যে তার উৎস, সহানুভূতিতে তার সঞ্চার।

সেই চরিত্র মাধুর্যের কথায় ফিরে আসা যাক।

ইসলামে মদ খাওয়া বারণ। কিন্তু মধ্য এশিয়া ও তাতারিস্থানের মুসলমানদের মধ্যে মদ বাদ দিয়ে উৎসবই হত না। মদ ছিল প্রাতিদিনের বিলাস। তবু অনেক বয়স পর্যন্ত বাবর নিজে কখনো মদ স্পর্শ করেন নি, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আর অন্যান্য উপজাতির সর্দারদের আনন্দে বাধা দেননি বা বিরক্ত বোধ করেননি।

একদিন পূর্বপুরুষ তৈমুরের বংশের প্রধান শাখা মীর্জা বংশীয়দের নিমন্ত্রণে বাবর তাদের তারেবখানা অর্থাৎ প্রমোদ-ভবনে গেলেন। খানার পর পিনা শুরু হল। আমরা খানার আগেই আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক প্রভৃতি মিষ্টি কথায় অভ্যর্থনা করে শরবত বা ওই জাতীয় কিছু দিই। তারপর শুরু হয় খাওয়া। ওরা খাওয়ার পরই নিমন্ত্রিতদের তরল আবাহন আরম্ভ করল। তার পর বার বার এমনভাবে পেয়ালা ভরা ও শেষ করা হল যেন যে জল না হলে প্রাণ বাঁচে না, তাই বুঝি পান করা হচ্ছে। বাগ-ই-জাহান-আরার মধ্যে প্রমোদভবনে সবারই মন গরম আমেজে ভরে উঠল। মীর্জারা বাবরকে তাদের দলে যোগ দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। একবার ভাল করে মাতাল হলে কি রকম লাগে তা যাচাই করে দেখবার যে মনে মনে লোভ ছিল তা বাবর স্বীকার করতেন। তিনি ভাবলেন যে, দেখা যাক না একবার এই বাধার নদী পার হয়ে, দেখা যাক না ওপারে কি সুখ অপেক্ষা করছে। ছেলেবেলায় চারদিকে অনেককে মদ খেতে দেখেছিলেন কিন্তু প্রলোভন অনুভব করেন নি। এমন কি, নিজের বাবা যখন মদ খেতে অনুরোধ করেছেন তখনো তিনি রাজী হন নি। নীতিবাগীশ বলে তাঁর এত দুর্নাম হয়ে গিয়েছিল যে, যে উঠতি বয়সে নতুন জিনিস চেখে দেখার দারুণ লোভ জন্মায় তখনো তাঁকে কেউ এ সুখে দীক্ষা নিতে অনুরোধই করল না।

আর নিজের সভাসদ্‌রা রাজার প্রতি সম্মান দেখিয়ে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে দরজা বন্ধ করে মাসে বছরে একবার তারা প্রাণ ভরে পান করে নিত। কিন্তু নির্ভয়ে নয়, সভয়ে। যদিও সাগ্রহে।

এমন অবস্থায়, বিশেষ করে যখন মীর্জাদের অনুরোধ একবার প্রত্যাখ্যান করে ফেলেছেন—তখন এই নিমন্ত্রণে কি করে আর প্রথম দীক্ষা নেওয়া যায়।

তিনি এই বাধার কথা তাদের গোপনে জানালেন। কাজেই এবারকার মত তাঁরা তাঁকে আর জোর করলেন না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই আর একটা উৎসবের আয়োজন করা হল। সবচেয়ে বড় মীর্জা তাঁর বিখ্যাত বাগ-ই-জাহান-আরাতে অর্থাৎ ভুবনশোভা বাগানে মকাউভিখানায় (ভারামঘরে) বাবর ও তাঁর সংগী সভাসদ্ সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। বাবর কখন লক্ষ্য করছেন না তা নজর করে এরা লুকিয়ে লুকিয়ে এক চুমুকে এক এক পেয়ালা শেষ করে আবার সাধু সেজে যেতে লাগলো। অবশ্য এতটা সাবধান হবার কোন দরকার ছিল না। কারণ এরকম সামাজিক ভোজের চলতি নিয়ম অনুসারে পান করাতে বাবর কোন আপত্তির কারণ দেখতেন না। যাই হোক, এই উৎসবে আপত্তির শেষ কারণ দূর হয়ে গেল।

পান বিড়ি সিগারেটে পর্যন্ত যে অনভ্যস্ত তাঁর মুখ থেকে পানোৎসবের কাহিনী শোনা বড় আমোদের—বললেন ফরাসী বন্ধুটি। আরো এরকম কাহিনী শোনাবার জন্য অনুরোধও করতে লাগলেন।

আমার নিজের দিক থেকেও কোন আপত্তি ছিল না। যুদ্ধের বাজারে দুর্লভ ককটেল পার্টিতে আমিই নাকি যোগ্যতম বন্ধু যার হাতে ওয়াইন সেলারের চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

আর একবার বাবরের পালাজ্বর হতে লাগল। দু' দিন তিন দিন বাদ দিয়ে জ্বর আসে। শিরা কেটে রক্ত বের করা ছিল তখনকার দিনে, এমন কি. একশ বছর আগেকার আমেরিকাতেও, এসব ব্যাপারে মোক্ষম চিকিৎসা। সেই চিকিৎসাও করা হল, তবু জ্বর ফিরে ফিরে আসে। একবার ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায় আবার আসে। হায়! মালোয়ারীর কোন ওষুধের বোতল তখনকার দিনে ছিল না, না ছিল সর্বজ্বরহর বটিকা। হাকিম নার্গিস ফুলের রেণু মিশিয়ে মদ দিলেন; কিন্তু ম্যালেরিয়া তাতে নরম হল না।

এমন সময় একজন প্রিয় বন্ধু আজকাল যাকে বলে ড্রিংক পার্টি তাই দিতে চাইলে। বাবর জানতেন যে, হাসবার সময় সারা পৃথিবী সংগী হয়, কিন্তু কাঁদবার সময় হতে হয় নিঃসংগ। তাই ছেলেবেলা থেকেই অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, পৈত্রিক রাজ্য হারান ও রাজ্য গড়ার নোঙগরহীন জীবনে কখনো অপরকে নিজের মনোভার চাপাতে চান নি। শুধু অনুকূল পবনে মাঝ দরিয়ায় সুখদুঃখের সাথীদের নিয়ে এক সংগে পাল তুলে বেড়িয়েছেন। এ সময় হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থান প্রান্তে ভারতীয় ও আফগানরা বিদ্রোহ করে তাঁর প্রতিনিধি

শাসনকর্তা হিন্দুবেগকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু তিনি এই উৎসবে সম্মতি দিলেন। নিজের ভারে ত' আর সারাদিন নুয়ে থাকা যায় না।

বাবর বললেন,—আমার বন্ধুবান্ধবরা আনন্দে আত্মহারা হবে আর আমি গুরু গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে থাকব এ কখনো হতে পারে না। তোমরা আমার কাছে এসে আনন্দ কর। নিজের বহু যত্নে সাজান চেনার বাগে ঢুকবার মুখেই ছিল সুরৎখানা অর্থাৎ ছবিঘর। সেখানে এই উৎসব হল। মুখে মুখে একটি কবিতা বানিয়ে তিনি বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই তুর্কী রুবাই কবিতার বাংলা অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়ঃ—

বন্ধুরা মম আজিকার এই
রুপের গোলাপ বাগে।
পান উৎসবে পরস্পরের
সঙ্গসুধায় জাগে॥
বঞ্চিত আমি তাহাদের প্রিয়
সঙ্গমাধুরী ব্রতে।
শত প্রার্থনা তবুও করেছি—
বাঁচো অনিষ্ট হ'তে॥

দিল্লীতে জাতীয় দলিল ও পুঁথিপত্রের দপ্তর ন্যাশনাল আরকাইভে বাবরের আত্মজীবনীর একটি বাইশ হাজার টাকা দিয়ে যোগাড় করা কপি আছে। নানা রঙে ও সোনায় আঁকা দু'শো তিরাশীখানা প্রাচীন ছবিতে সাজান বইখানাতে এই কবিতার মূল রুবাইটি আছে।

। কিন্তু বাবর ছিলেন যোদ্ধা। লড়াই করা যার নেশা, শুধু কবিতার বড়াইয়ে তার আশা মিটবে কেন? একটু পরে গায়ে জ্বর নিয়েই অসুস্থ অবস্থাতেই খচ্চরে টানা চৌদোলা তখৎ-রওয়ানে চড়ে বন্ধুদের মাঝখানে হাজির।

বন্ধুরা বান্দা হয়ে গেল চিরকালের জন্য।

এই বন্ধুরাই বাবরের ফতেপুর শিক্রির যুদ্ধজয়ের পাণ্ডা।

ওরা রাণা সঙ্গের বিশাল সৈন্যদল দেখে ও রাণার বিক্রমের কথা শুনে কাবুল যে কত ভাল জায়গা আর হিন্দুস্থানের স্বাস্থ্য যে কত খারাপ সে সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করে পিছনে হঠবার পথ ঠিক রাখছিল। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত মহম্মদ শেরিফ নামে এক জ্যোতিষ এসে জুটল তাদের

দলে। সে গণনা করে সবাইকে বলল যে, মঙ্গল গ্রহ তখন পশ্চিমে উঠেছে এবং যে কেউ উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ দিল্লী আগ্রার মত পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করবে সেই হেরে যাবে।

বাবর তখন চারদিকে কামান সাজিয়ে গোলন্দাজ ও বরকন্দাজদের ভাল করে তালিম দিতে লাগলেন। চারদিকে লুটপাট করিয়ে সবাইকে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন ঘোড়া চড়ে সৈন্যদের ঘাটি পরীক্ষা করতে করতে ভেবে দেখলেন যে, বড় একটা লাভের জন্য বড় একটা ত্যাগ করা দরকার। হিন্দুরাও গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়ে 'সফল' পাবার জন্য জন্মের মত একটা ফল ত্যাগ করে। কিন্তু সে হচ্ছে মনকে চোখ ঠারার মত। সত্যিকারের ত্যাগ তার মধ্যে কিছুই থাকে না। কারণ বিশেষ কিছু ভোগ মাখান থাকে না ওই ফলের মধ্যে। যে জিভ আম কাঁঠাল ও মর্তমানের স্বাদে অভ্যস্ত সে জিভে নিমফল আর এ জীবনে খাব না এই মানৎ করার মধ্যে ত্যাগটা কোথায়?

যাহা চাই তাহা ঠিক পেতে চাই,
যাহা পাই তাহা ছাড়ি না।

বাবর কিন্তু সত্য সত্যই একটা বড় ত্যাগ করলেন। মদের মধ্যে তিনি প্রথম প্রণয়ের মাদকতা পেয়েছিলেন। সেই মদ একেবারে ছেড়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। ঠিক সে সময় তাঁর এক বন্ধু সুদূর কাবুল থেকে ফিরে এল। বাবরের ফরমায়েস ছিল গজনীতে বানান বাছা বাছা সেরা মদ। তিন সারি উটের পিঠে চাপিয়ে পাঁচ শ জন লোকের সঙ্গে তা আনান হয়েছিল। কী বিরাট্ এলাহি ব্যাপার তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

এই এরোপ্লেনের যুগে কোন বন্ধু সন্ধ্যাবেলা কলকাতায় গঙ্গার ধারে ইলিশ মাছ কিনে রাতারাতি নাইট প্লেনে করে তা দিল্লী নিয়ে এলে আমরা যা সোরগোল লাগাই তার ঢেউ দক্ষিণে কুতুব মিনার থেকে উত্তরে কাশ্মীরী গেট পর্যন্ত কোন্ না কোন্ তের মাইল পৌঁছিয়ে যায়। বন্ধুবান্ধবরা টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়েই দিনের সবচেয়ে গরম খবরটার সঙ্গে সঙ্গে ইলিশের গন্ধ পেয়ে যান। যারা নেহাত আগে থেকে অন্য কাছে আটকিয়ে গিয়েছেন বলে আসতে পারেন না, তাঁদের আফসোসের ধোঁয়া ঝোলটা পাতে

ঢালবার সময় নতুন করে দেখতে পাওয়া যায়। আর র‍্যাশনের বাজারে সপ্তাহের শেষ দিনটা যে চাল বাড়ন্ত নিশ্চয়ই হবে সে দারুণ দুশ্চিন্তাটাকে একবারও মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেওয়া হয় না। পান চিবেতে চিবোতে বন্ধুরা মনের সুখে দারোগা হওয়ার আশীর্বাদ করতে থাকেন।

আর সেই সাড়ে চার শ বছর আগেকার দিনে উটের ক্যারাভান আসছে গজনী থেকে আগ্রা। মাসেব পর মাস শত্রুর এলাকা, ডাকাতের আওতা এড়িয়ে খাইবার পাস ও পঞ্চনদ পেরিয়ে আসছে মদের জালা। এ যুগের পৃথিবীতে এক এভারেস্টের চূড়ায় চড়া ছাড়া এর চেয়ে শক্ত আর কোন যাত্রার কথা ভাবা যায় না। জেট এরোপ্লেন কমেট ত' সত্যি সত্যিই ধূমকেতু। পারসিয়ান কার্পেটের আরামে গা ঢেলে দিয়ে ক' ঘণ্টায় সেই বিলেত থেকে বোম্বাই।

এমনি সেই মদ, হিসাব করে যার দাম ধরা যেত না সে যুগে। বিশেষ করে বাবরের মত পানরসিকের কাছে সেই মদের কি দাম হতে পারত তা বুঝতে পারা শক্ত নয়। তা-ও বাবর ছেড়ে দিলেন। ভগবানের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিলেন। ফারসী কবিতায় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন,

চান্দ্ বাশি জে মাসি মজাকুশ্
তোবা হাম্ বে মজে নেশ্ত্ বাজুষ॥
আরো কতদিন পাপে মেতে থেকে
আনন্দ পাবি মন?
অনুশোচনারে আস্বাদ কর্,
বড় সে মধুর ধন।

যত সোনা রুপোর পেয়ালা, গেলাস আব অন্যান্য মদ খাবার সাজসরঞ্জাম ছিল সব জড়ো করে তিনি ভেঙ্গে ফেললেন। ওই দামী জিনিসের টুকরো-গুলি পর্যন্ত যাতে সংসারী কারো হাতে না পড়ে সেজন্য সে সব দরবেশদের দিয়ে দিলেন। তারা সোনা রুপো বেচে গরীবদের সেবার কাজে সেগুলি লাগাতে পারবে। সে রাত্রে আর তার পরের রাত্রে সব আমীর, পারিষদ্, সৈন্যরা এসে একে একে মদ ছাড়ার শপথ করে গেল। ওই মদের সবটাতে নুন ঢেলে নষ্ট করে দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হল। পরে সে জমিতে ভিখারীদের জন্য একটা বাড়ি বানান হয়েছিল।

তারপর তিনি একটা ফারমান লিখে সকলের মধ্যে তা বিলি করলেন। "আমরা ক্ষমাকারীর প্রশস্তি করছি। তিনি অনুশোচনাকারীদের ও যারা পাপ থেকে নিজেদের পরিষ্কার করে নিয়েছে তাদের ক্ষমা করেন।...হে আমার স্রষ্টা, আমরা রিপু জয় করেছি। তোমার দলে আমাদের নিয়ে নাও, কারণ মনের মধ্যে আমি লিখে রেখেছি যে এই প্রথম আমি সত্যিকারের মুসলমান হয়েছি।"

তার আমীর ও উজীররা এতদিন ভয়ে জড়সড় হয়ে মাথা নীচু করে থাকত। তারা রাণা সংগের নাম দিয়েছিল রাণা শংক—এতই শংকা হয়েছিল তাদের মনে। রাজপুতদের বিক্রমের চোটে বহু জেলা আর পরগণা বাবরের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এইরকম মনে অবস্থা যাদের তাঁদের নিয়ে যুদ্ধ চলে না। তাই সবাইকে এক সংগে ডেকে তিনি মনের কথা সব বললেন; তাদের হৃদয় স্পর্শ করে বোঝালেন যে, মৃত্যুই হচ্ছে অমর হবার পথ। ফিরদৌসীর শাহ্‌নামা থেকে তাদের শোনালেন যে,

যদিও মরিব, কীর্তিরে লয়ে
সন্তোষ পাব আমি।
কীর্তি আমারি, মৃত্যু যখন
হবে মোর দেহ-স্বামী॥

আরো বললেন যে, পরমেশ্বর আল্লাই তাদের এমন সৌভাগ্যের সূচনা এনে দিয়েছেন। তারা যদি যুদ্ধ করতে করতে মরে, শহিদ হতে পারবে। আর যদি বাঁচে, তাহলে গাজী হয়ে আল্লার পক্ষের জয় এনে দিতে পারবে।

এ যুদ্ধে কি ফলাফল হয়েছিল তা আপনি ইতিহাসের ছাত্র না হয়ে থাকলেও এতক্ষণে নিজেই বুঝে নিতে পারবেন।

শুধু তাই নয়।

রাণা সংগ ত' আহত হয়ে যুদ্ধে হেরে মেবারের পাহাড়ের দিকে পালালেন। প্রতিজ্ঞা করে গেলেন যে না জিতে চিতোরে ফিরে যাবেন না। কিন্তু চিতোরে তাঁকে আর ফিরতে হয়নি। আবার সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে যখন তিনি যুদ্ধের জন্য এগোবার বন্দোবস্ত করলেন তখন তাঁরই সর্দাররা লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে হয়রাণ হয়ে এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সংগকে বিষ খাইয়ে মেবে ফেলল। দেশ চুলোয় যাক, আমরা ত' আরাম করি।

সংগ ছিলেন একমাত্র রাজপুত রাজা যিনি সমগ্র সম্মিলিত রাজস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সবাইকে নিয়ে বিদেশী বিধর্মী শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী বাবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুর এই স্বপ্ন সফল হবার নয়। তিনি লিখে গিয়েছেন যে, বড় বড় বংশের রাজা ও রায়রা, সর্দার ও সেনাপতি যারা এই যুদ্ধে সংগের দলে যোগ দিয়েছিল তারা কেউ আগে কোন যুদ্ধে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেনি। এমন কি, নিজেদের মর্যাদাকে বড় করে দেখতে গিয়ে তাঁর সংগে সদ্ভাব পর্যন্ত রাখেনি। রাঠোর চৌহান কাছোয়া এসব বংশের রাজারা শিশোদীয়া বংশের রাজার কাছে মাথা নিজে থেকে নোয়াতে চায়নি। কাজেই হিন্দুপৎ রাণা সংগ শুধু নামেই ছিলেন হিন্দুপতি।

শুধু বীরত্ব অথবা হাসিমুখে মরবার ক্ষমতা দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। তাই রাজপুত বীরত্ব শুধু কবির অমর কবিতায় কীর্তি লাভ করে গেছে। কিন্তু শত্রুর সংগে সামনাসামনি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত কাজের বেলায় সার্থক হয়ে ওঠেনি।

মারি অরি ছলে বা কৌশলে। ছল ত' দূরের কথা, ধর্মযুদ্ধে তার কোন স্থানই হিন্দু শাস্ত্রকাররা রাখতে চাননি। কৌশলও আমাদের খুব উঁচুদরের ছিল না। রাজপুত ব্যক্তিগত বীরত্ব বা কষ্ট সইবার ক্ষমতাতে তুর্কী বা পাঠানের চেয়ে কিছুমাত্র কম যেত না। কিন্তু রাজপুত ঘোড়সোয়ার চড়ত দেশী বা পাহাড়ী ছোট ঘোড়া আর মুসলমান তার তুলনায় উল্কার মত ছুটে আসত খোরাসানী (মধ্য এশিয়ার সব জায়গাকেই তখন হিন্দুরা খোরাসান বলত) টগবগে ঘোড়ায় চড়ে। হিন্দু সৈন্যদের বারবার মুসলমানরা ছত্রভংগ করে হটিয়ে ও হারিয়ে দিয়েছে এই তেজী ও উঁচু ঘোড়ায় চড়া ঘোড়সোয়ার দিয়ে। রাজপুতের যুদ্ধযাত্রায় রোম্যান্স ছিল, স্ট্রাটেজি নয়। ঠমকে চমক লাগাত, কৌশলে কাযদা করত না।

সে রকম ঘোড়ার উত্তর ছিল হিন্দুর হাতী। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় পুরু রাজার হাতীরা বিজয়-স্তম্ভের মত দলবলে এগিয়ে এসে গ্রীকদের নাভিশ্বাস এনে দিয়েছিল। কিন্তু একবার হাতীর নূতনত্ব চলে গেলে বর্শা আর দূর থেকে ছোড়া তীর দিয়ে হাতীকে অস্থির করে তুলে সৈন্যদের বিশৃংখল করে দেওয়া খুব সহজ হত।

হাতীর পিঠে চড়ে রাজারা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র লক্ষ্য করে সৈন্য চালনা করতে পারতেন। কিন্তু ঠিক তেমনি তারা নিজেরাও শত্রুপক্ষের সহজ ও সুবিধাজনক

লক্ষ্য হতেন। বার বার দেখা গেছে যে, হিন্দু রাজা বা সেনাপতির উপর দূর থেকে ভাল করে নিশানা করে শত্রুসৈন্য তীর ছুড়েছে। রাজা বা মাহুত যে কেউ জখম হলেই সৈন্যদের মধ্যে এমন হতাশ ভাব এসেছে যে, নেতার বিহনে তারা জেতা যুদ্ধও হেরে পালিয়ে গিয়েছে। শূন্য হাওদা দেখলেই সৈন্যরা আর ভেবে পেত না যে, কার জন্য যুদ্ধ করবে। মাহুত বা হাতী আহত হলেই চারপাশে এমন গোলমাল হত যে, স্বপক্ষের সৈন্যরাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। আলেকজাণ্ডারের সময় থেকে এই সাধারণ শিক্ষাটুকু হিন্দু রাজাদের কখনো হয়নি।

আর তারা শত্রুর নূতন রণকৌশল অনুসারে নিজেদের যুদ্ধপদ্ধতি বদলিয়ে নিতেন না। বাবরের সঙ্গে ছিল কামান, ছিল গোলন্দাজ ও বরকন্দাজ—যারা বজ্রের মত কঠোর তীর বিদ্যুতের মত বেগে ছুড়তে পারত। বহুদিন ধরে ফতেপুর শিক্রির প্রান্তরে বাবর তাঁর কম সৈন্যই ভাল করে সাজাচ্ছিলেন। যেখানে কামান ছিল না সেখানে দরকার মত যাতে কামান তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনে বসান যায় তার বন্দোবস্ত করছিলেন। তীরন্দাজদের যাতে শত্রুর আক্রমণ থেকে আড়াল করা যায় তার বন্দোবস্ত করছিলেন। পাশ থেকে যাতে শত্রু হঠাৎ এসে হাজির না হতে পারে সেজন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আর সেনাপতি থেকে সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত সবাইকে এক বাঁধনে ও বর্মে ঢেকে রাখা হয়েছিল—তা হচ্ছে ইসলাম। তাকে এগিয়ে যেতে হবেই, কারণ পিছনে পালাবার পথ নেই। কিন্তু রাণা সঙ্গ সে সব কিছুই নজর করেননি। হাতে সময় ও সঙ্গে সাহায্য ছিল প্রচুর। কিন্তু শুধু ছিল না রণকৌশল। তাই তার অশ্বারোহী দল ঠাসা ব্যূহ রচনা করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এগিয়ে এসে শত্রুর কামানের সহজ ও পাইকারী লক্ষ্য হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও রাজপুত বীররা এই এক প্রথায় যুদ্ধ করে গেছে।

সবার উপরে সর্বনাশ করল সেই হাতী। ভারতীয় চতুরঙ্গের বড় অঙ্গ হাতী। তার উপরে থেকে সঙ্গ সৈন্য চালনা করছিলেন আর বাবরের তীরন্দাজরা দূর থেকে এমন সহজ লক্ষ্যকে তাক করতে ভুল করেনি। একটি চোখ ও একটি বাহু রাণার আগেই গিয়েছিল। এবারে তার কপালে হল তীরাঘাত। ভাগ্য এসে রাজপুতের কপালে করাঘাত করে গেল।

হিন্দুর সিদ্ধিদাতা দেবতা হচ্ছেন গণেশ। স্থির, ধীর, অবিচল। কিন্তু

তার মুখে আছে হাতীর প্রতিচ্ছবি। হাতী অচঞ্চল, কিন্তু হায় অপরিবর্তনশীলও বটে। তার গতিতে আছে যতি, যাযাবরতায় ভরা স্থাবরতা।

আমরা শুধু শেষের অংশটুকু বেছে নিয়েছি। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বেঁধেছি। সেটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

ইতিহাসের শিক্ষা আমরা কখনো নিইনি।

॥ ৯ ॥

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সর্দার প্যাটেল মনে মনে শপথ করলেন যে, হিন্দুস্থান যখন স্বাধীন হয়েছে, এবার সোমনাথের ভাঙা দেউলের জায়গায় নতুন মন্দির গড়ে তুলতে হবে।

সমস্ত দেশ সে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় সাড়া দিল।

সোমনাথের কাহিনী ঠিক রাজস্থানের অর্থাৎ এ যুগে রাজপুতানা বলতে যা বুঝায় তার কাহিনী না হলেও রাজপুতের কাহিনী বটে। রাজপুতানার সংগে তার খুব নিবিড় সম্বন্ধ। কারণ রাজোয়ারা বলতে সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি জায়গার রাজপুতদের দেশও বাদ দেওয়া ঠিক হবে না।

আর সোমনাথের আক্রমণ এসেছে রাজপুতানার বুকের উপর দিয়ে। গজনীর সুলতান মামুদ রাজপুতানায় উট যোগাড় করে বিকানীর আজমীরের পথে সোমনাথে এসেছিলেন। রাজস্থানে কোন বাধাই পাননি।

সর্দার প্যাটেলের মত আরো একজন সর্দার এ মন্দির সম্বন্ধে অন্যরকম একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

চাকতির দু' পিঠের তুলনা এবার করে দেখা যাক।

মামুদের বাবা ছেলের জন্মদিনে অনেক দেবমূর্তি ভেঙে উৎসব করলেন। আর প্রার্থনা করলেন যেন ছেলেও এই রকম সুমতি পায়। পুত্ররত্নও রাজা হয়েই শপথ করলেন যে, প্রত্যেক বছর হিন্দুস্থান আক্রমণ করবেন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে তিনটিরই সাধ তাহলে হাতে হাতে মেটান যায়। তার উপর চতুর্থটিও ইহলোকের মতই নানারকম সুখের ডালি নিয়ে পরলোকে অপেক্ষা করবে। কাজেই মামুদের ও তার সৈন্যদের উৎসাহের অভাব ছিল না। এদেশের রাজাদের শরৎকালে দিগ্বিজয়ে যাবার প্রথা ছিল। তিনিও প্রত্যেক শরতের শেষে ভীষণ ঠাণ্ডা গজনী থেকে দলে বলে বের হয়ে হিন্দুস্থানের আরামদায়ক ঠাণ্ডায় কয়েক মাস কাটিয়ে গরমের সময় গজনীতে ঠাণ্ডা হবার জন্য ফিরে যেতেন।

পাঞ্জাবের এক রাজপুত রাজা জয়পাল একবার ভীষণ যুদ্ধ করে সুলতানকে

বাধা দিলেন। তার প্রায় তের শ' বছর আগে অর্থাৎ মানুষ যখন সভ্যতার আরো কিছু আগের ধাপে ছিল, তখন গ্রীক আক্রমণকারী আলেকজান্ডার ঠিক এমনি ভাবে পাঞ্জাবে আর একজন রাজা পুরুর কাছে ভীষণ বাধা পান। পুরু ও জয়পাল দুজনকেই শত্রুর হাতে বন্দী অবস্থায় শত্রুপক্ষের রাজার কাছে শৃঙ্খলে বাধা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়।

তারপর কি হ'ল তাই বলছি।

পুরুকে আলেকজান্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্দী, তুমি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার আশা কর?"

পুরু উত্তর দিলেন, "রাজার মত ব্যবহার।"

আলেকজান্ডার অবাক হয়ে এই বীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। পুরু আবার নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বললেন, "রাজার মত। এই যা আমি বললাম, এই কথার মধ্যেই সব কথা বলা হয়ে গেছে।"

এর ঠিক তেরশ' সাতাশ বছর পরে জয়পাল বন্দী অবস্থায় মামুদের সামনে আনীত হলেন। উতবী নামে এক ঐতিহাসিক তারিখ-ই-ইয়ামিনি বইতে লিখে গেছেন, যে, "আল্লার শত্রু জয়পাল, তার ছেলেরা, পৌত্ররা, ভাগ্নেরা, সব সর্দাররা আর আত্মীয়রা ধরা পড়ল। দড়ি দিয়ে তাদের শক্ত করে বেঁধে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যারা বদমায়েসী করেছে, যাদের মুখে বিধর্মীর ধোঁয়া দেখা যায়, যাদের দুর্ভাগ্যের বাষ্প ঢেকে দিয়েছে, তাদের যেমনভাবে বাঁধা অবস্থায় নরকে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক তেমনভাবে। কারো কারো হাত পিঠের পিছনে বাঁধা। কারো গাল পাকড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল কাউকে বা ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে। প্রকান্ড মুক্তা ও চকচকে মণি-চুনীতে সাজান সোনার হারটা জয়পালের গলা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। সেটার দাম ছিল দু' লক্ষ দীনার।......আল্লা তাঁর বন্ধুদের এমন লুঠপাটের ধন দিলেন, যার কোন মাপজোখ নেই, যা হিসাবের বাইরে। তার মধ্যে ছিল পাঁচ লক্ষ সুন্দর পুরুষ ও নারী। তাদের ক্রীতদাস করা হল।"

জয়পাল অপমান সহ্য করতে না পেরে মুক্তি পাবার পর চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেন।

তার ছেলে আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতির রাজাদের সাহায্য নিয়ে মামুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেন। এই সময়ের রাজপুত নারীরা পরের যুগের রাজপুতানীদের

মতই যথেষ্ট সাহায্য করে। তারা অস্ত্রশস্ত্র কিনবার জন্য নিজেদের সব গহনা বিক্রী করে দেয়। গরীবরা সৈন্যদের কাপড় বোনার জন্য নিজেরা বিনা পয়সায় সুতো তৈরী করে কাপড় বুনে দেয়।

এ যুগের বিশ্বযুদ্ধে বিলেত-ঘেঁষা আধুনিকারা দিল্লী কলকাতার রাজপথে মরণ-পণ করে রাস্তায় মিলিটারী মোটর চালিয়েছেন। ট্রাক, মোটর-সাইকেল, জীপ নিয়ে ডেসপ্যাচ রাইডারের কাজ করেছেন। লাটভবনে বা স্বামীর বড়কর্তার কর্ত্রীর নেতৃত্বে পশমের মোজা, পুলোভার বুনেছেন—'ফ্রণ্টে' যারা লড়াইয়ে গেছে তাদের জন্য। কিন্তু ডেসপ্যাচ রাইডার হয়ে তাঁরা পরেছেন স্মার্ট মিলিটারী ইউনিফর্ম। মোজা, পুলোভার বোনার পিছনে রয়ে গেছে খবরের কাগজে ছবি উঠবার বা পরে অন্তত একটা ছোটখাটো খেতাব বা নিদেনপক্ষে সোনা-রুপোর না হোক ব্রোঞ্জের কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডাল পাবার সম্ভাবনা। কিন্তু তা বলে গহনা বিক্রী? নেভার নেভার।

সেবারকার আক্রমণে যুদ্ধ জিতে মামুদ গজনীতে ফিরে গেলেন এত ধনরত্ন নিয়ে যে, তার তুলনা পাওয়া যায় না। "অসংখ্য মণিমাণিক্য, মুক্তা, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত ঝকমকে বা বরফে জমান লাল মদের মত চুণী, চিরশ্যাম লতার তাজা শাখার মত সবুজ পান্না, ডালিমদানার মত ওজন আর মাপের হীরে।" এর পরের বার মথুরার মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করে লুঠ করলেন পাঁচ পাঁচ গজ লম্বা খাঁটি সোনার পাঁচটি মূর্তি; চোখ তাদের মহামূল্য মণি দিয়ে তৈরী।

থানেশ্বর সে সময় হিন্দুদের কাছে মক্কার মত ছিল শুনে মামুদ থানেশ্বর লুঠ করবেন ঠিক করলেন। রাজা আনন্দপালের ভাই মামুদের কাছে গিয়ে মন্দিরটি বাঁচাবার জন্য মিনতি করলেন। বললেন যে, মূর্তি ধ্বংস করাই যদি সুলতানের পক্ষে বড় কীর্তি ও পুণ্য হয, তাহলে তা ত' এতদিনে অক্ষয়ভাবে অর্জন করা হয়েই গেছে। থানেশ্বরের মন্দির যদি রক্ষা পায়, তাহলে বছরে বছরে হিন্দুরা তাকে ভারী হাতে নজরাণা দিতে রাজী আছে। নিবেদনকারী নিজেও পঞ্চাশটি হাতী ও অসংখ্য মণিমুক্তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, মামুদ উত্তর দিয়েছিলেন যে, বিশ্বাসীদের (অর্থাৎ আল্লায় বিশ্বাসীদের) ধর্মে বলে যে পৌত্তলিকতা যত বিনষ্ট করা হবে ততই স্বর্গে পুরস্কার বাড়তে থাকবে। কাজেই থানেশ্বরকে কি করে বাঁচান যায়!

সেবার গজনীতে দু' লক্ষ বন্দী আমদানী হল। প্রত্যেক সিপাহীর অনেক-

গুলি করে দাস ও দাসী জুটে গেল। গজনীকে যেন একটা হিন্দুস্থানেরই শহর বলে মনে হতে লাগল।

সোমনাথ মন্দির ভাঙবার সময়ও ঠিক এমনি উত্তর মামুদ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা নিবেদন করলেন যে মূর্তি অক্ষত রাখলে তারা মামুদকে বহু কোটি মোহর প্রতিদানে দেবেন। তারিখ-ই-আলফিতে বর্ণনা আছে যে, এই প্রস্তাবে মামুদের ওমরাহরা খুব খুশী হয়ে রাজী হন ও মামুদকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, একটা মূর্তির চেয়ে কোটি কোটি মোহরের দাম বেশী। কিন্তু মামুদ বলেন যে, শেষের সেদিন যখন আল্লা সবাইকে ডাক দেবেন সেদিন তিনি যেন টাকার জন্য পৌত্তলিকদের কাছে প্রতিমা বিক্রী করেছে যে মামুদ তাকে না ডেকে সবচেয়ে বড় প্রতিমা ভেঙেছে যে মামুদ তাকে ডাকতে পারেন। এই হচ্ছে সুলতানের মনের একান্ত সাধ।

এই বলে মামুদ নিজের হাতে খড়্গ তুলে সোমনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। তার ভিতরে এত মণিমুক্তা পাওয়া গিয়েছিল যে যত কোটি সোনার মোহর ব্রাহ্মণরা দিতে রাজী ছিল তার একশ গুণের চেয়ে বেশী তার দাম হবে।

আজ আমরা সেই মন্দির ও সেই জ্যোতির্লিঙ্গ আবার প্রতিষ্ঠা করেছি সেই সোমনাথে। গুর্জর রাজপুতদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা হবে হিন্দুস্থানের জনসাধারণের দেওয়া সামান্য সামান্য চাঁদা একসঙ্গে করে এই অসামান্য মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সেদিন সোমনাথের মন্দির রক্ষার জন্য হিন্দুস্থানে কোন সাড়া পড়েনি। গজনী থেকে গুজরাটের পথে কোন হিন্দুরাজা দেয়নি যুদ্ধ। কোন গণজাগরণ দেয়নি বাধা। দুর্গ ভেঙে মামুদ যখন মন্দিরের দেওয়ালের নীচে এসে দাঁড়ালেন ভক্তরা ভগবানের আত্মরক্ষার ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই নিজেদের কর্তব্য সমাধা করেছিল। তারা পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের ঠাট্টা পর্যন্ত করেছিল। পরদিন মামুদের সৈন্যরা ভীষণ যুদ্ধ করে পাঁচিল দখল করে ভিতরে নেমে পড়ল। কিন্তু যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে সে রাত্রিতে মন্দির আক্রমণ করল না। সারারাত্রি হিন্দুরা ভিড় করে মন্দিরে কাঁদল। বুক চাপড়িয়ে চোখের জলে ভগবানকে আত্মরক্ষা করতে জাগবার জন্য তারা ডাকল।

কিন্তু হায় ভক্ত যদি নিজে না নড়ে, ভগবান কাকে দেবেন সাড়া?

ভোর বেলা গজনীর সৈন্যরা আবার আক্রমণ করল। সরু সরু গলির

প্রত্যেকটিতে হিন্দুরা লড়াই করে মরতে লাগল। লড়াই চলল মন্দিরের দরজা পর্যন্ত। তরবারীর মুখে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু প্রাণ দিল সেই মন্দিরের সামনে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

একথা আমরা সংস্কৃত ভাষায় শুনি আর সংস্কারের বশে ভুলে যাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা বলহীন হয়ে থেকেছি, হাত জোড় করেছি আর নতশিরে মরেছি।

তবু আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে হারাইনি। শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিইনি।

চাকতির দু-পিঠের তুলনা করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। গুণগ্রাহী মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই তা তুলনা করে দেখা যাক।

মহম্মদ উফি তার জমাইউল হিকায়ত নামে বইতে মুসলমান রাজত্বের প্রথম যুগের অনেক কাহিনী ও নিজের চোখে দেখা ঘটনা লিখে গিয়েছেন। তার মধ্যে আমরা মুসলমানের প্রতি হিন্দুর ব্যবহারের সুন্দর উদাহরণ পাই।

যে সোমনাথের মন্দির মামুদ ভেঙেগ যান, তার কাছে গুজরাটের মধ্যেরই একটি ঘটনা।

সমুদ্রের পারে কম্বায়েৎ (কাম্বে) শহরে অনেক মুসলমান ও অগ্নি উপাসক থাকত। অগ্নি উপাসকদের প্ররোচনায় হিন্দুরা একবার সেখানকার মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়, আজান দেওয়ার মিনার ভেঙেগ ফেলে ও আশি জন মুসল-মানকে মেরে ফেলে। মুসলমানদের তখনও সে অঞ্চলে কোন রাজত্ব বা প্রভাব ছিল না।

মসজিদে খুতবা পড়ত যে খাতিব সে পালিয়ে গিয়ে রাজদরবারে নালিশ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাজার সভাসদ্‌রা কোন নালিশ কানেই তোলে না। শেষে রাজা শিকারে যাচ্ছেন জানতে পেরে খাতিব পথে এক জঙ্গলে গাছের নীচে অপেক্ষা করতে লাগল। রাজা যখন সেখান দিয়ে হাতী চড়ে যাচ্ছেন, তখন সে উঠে দাঁড়াল ও হিন্দী কবিতায় রচনা করা নালিশটি রাজাকে জানাল। রাজা শুনে খাতিবকে যত্ন করে দেখাশোনার বন্দোবস্ত করলেন। পরে রাজধানী অনহিলপট্টনে ফিরে গিয়ে মন্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্য সব রাজকার্য দেখবার ভার দিয়ে অন্দরমহলে বিশ্রাম করবার জন্য চলে গেলেন।

কিন্তু বিশ্রাম নয়, বিচার।

সে রাত্রেই রাজা রওনা হলেন ক্যাম্বে শহরে। দুদিন পরে সেখানে পৌঁছে সাধারণ সদাগরের ছদ্মবেশে বাজারে ঘুরে ঘুরে সব খবর নিলেন। নিয়ে বুঝতে

পারলেন যে অকারণে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও তাদের হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি সমুদ্রের জল এক হাঁড়ি নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন ও বিচারসভায় সব পক্ষকে ডাকলেন। যারা মসজিদ নষ্ট করিয়েছিল, তারা নিজেদের কুকীর্তি ঢাকবার চেষ্টা করল। তখন রাজা তাদের সেই সমুদ্রের জলের হাঁড়ি দিয়ে সে জলে চুমুক দিতে বললেন। লোনা জল কেউ খেতে পারল না। তিনি তখন বললেন, যে সব ধর্মই সমান; অন্যধর্মী লোকদের কাছে কিন্তু ওই লোনা জলেব মত বিস্বাদ। কিন্তু তাবলে তিনি অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার হতে দিতে পারেন না।

তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সব প্রজাই ধর্মনির্বিশেষে তাঁর কাছে সমান আর তাঁর নিজের কর্তব্য তাদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া। তিনি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন যে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। তাই তিনি ব্রাহ্মণ ও অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য ধর্মীদের দু'জন করে নেতাকে শাস্তি দিলেন। মুসলমানদের মসজিদ ও মিনার আবার তৈরী করে নেবার জন্য দিলেন এক লক্ষ টাকা। আর ধর্ম সম্বন্ধে এই নালিশ তাঁর নজরে আনার জন্য খাতিবকে দিলেন চারটি পোশাক।

প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলতামশের রাজত্বকালে লেখা এই ঘটনা। লেখক মহম্মদ উফি কাম্বেতে নিজে গিয়ে তার বহু আগে ঘটা এই ব্যাপারটির সব সত্যতা যাচাই করে এসে লিখেছিলেন।

তাঁবই লেখা আর একটি ঘটনা থেকে হিন্দু রাজাদের নারীর প্রতি ব্যবহারের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর সম্মান ও স্বাধীনতা সেযুগে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এদিকে সেদিকে নারী মহিলা কবি বা তেজস্বিনী রাণীর সাক্ষাৎ কখনো মিললেও পথেঘাটে সাধারণ জীবনে নারীর স্থান খুব ছোট ও নীচু হয়ে এসেছে। সেই মরুভূমি সৃষ্টির আরম্ভের সময়ের একটি সরস শ্যামল ঘটনা।

গুরপাল নামে একজন গুর্জর রাজপুত রাজা ছিলেন। তাঁর প্রজাদের মতে এমন ভাল আর প্রবল রাজা খুব বেশী হয়নি। একদিন তিনি শিকারে গেলেন একা। হাতীর পিঠে চড়ে যেতে যেতে এক গ্রামের প্রান্তে দেখলেন যে একটি পরমাসুন্দরী রজকিনী জঙ্গলে ঢুকছে কাপড় কাচবার জন্য। পরনে তার রাঙ্গা শাড়ি, বরণ তার নিখাদ গোরী। রাজা একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

প্রেমিক কবির ভাষায় বলতে গেলে—

থির বিজরী
বরণ গোরী
চলে নীল শাড়ি
নিঙারি নিঙারি
পরাণ সহিত মোর।

কবি সে কথা লিখে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্যে মনের ব্যথাকে মিশিয়ে ঘরে ফিরে এসে প্রেমিকার স্বপ্ন দেখতে পারবেন। চাঁদের জন্য চকোরের কাকুতি, হৃদয়ের ব্যথাকে ভাষায় ব্যাখ্যান করা—এ ছাড়া আর কবির কিই বা করবার ক্ষমতা থাকতে পারে? বিশেষ করে রজকিনী যদি নেহাতই 'হাম সে অবলা' গোছের নারী না হয়? আর অন্য কোন কিছুই কবির পক্ষে কবিজনোচিত বা কাব্যশাস্ত্র অনুমোদিত হবে না।

কিন্তু সেকালের স্বৈরাচারের যুগের রাজার বেলা ত সে কথা খাটে না। বসুন্ধরা যেমন বীরভোগ্যা রূপসীও তেমনই নিঃসন্দেহে রাজভোগ্যা।

যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম। রাজা হাতী ছুটালেন রজকিনীর দিকে। বাসনা এসে বশ করে ফেলল রাজধর্মকে।

কিন্তু হঠাৎ রাজার মনে ফিরে এল রাজধর্মের কথা, নিজের কর্তব্যের কথা। তিনি মনকে সংযত করে কোনমতে নিজেকে সামলিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এসে তিনি সব পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ডাকালেন ও চিতা সাজিয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ব্রাহ্মণদের বললেন যে, রাজধর্মে তিনি পতিত হয়েছেন। কারণ, রক্ষক হয়ে ভক্ষক হতে যাচ্ছিলেন। অতএব সব পবিত্র করে দেয় যে আগুন তাতে এই দেহ তিনি বিসর্জন করবেন।

ব্রাহ্মণরা এই শাস্তি সমর্থন করলেন। বললেন যে, রাজার ক্ষমতা হচ্ছে অসীম। তিনি যদি কামবাসনা সংযত করতে না পারেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত সব কুলনারীরই অমর্যাদা হতে পারে। অতএব আগুনে পুড়ে প্রায়শ্চিত্ত করাই তাঁর উচিত।

চিতা জ্বালান হল। অগ্নিশিখা চারদিক উজ্জ্বল করে তুলল। সে শিখার দিকে রাজা হাতজোড় করে প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে গেলেন। চোখ তাঁর বন্ধ, কিন্তু মনে নেই কোন সন্দেহ।

আগুনে তিনি ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন এমন সময় ব্রাহ্মণরা তাঁকে ধরে ফেললেন।

বললেন যে, তাঁর অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে। তাঁরা বিধান দিলেন যে, রাজার মনই শুধু পাপ করেছিল; দেহ ছিল নিষ্পাপ। দেহ যখন কোন পাপ করেনি, চিতায় তাকে দাহ করলে নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর মন যা পাপ করেছিল, এই অগ্নিব্রতে তার শুদ্ধি হয়ে গেছে।

সব মনের জ্বালা দূর হয়ে গেল। রাজা প্রসন্ন মনে বহু টাকা দান করলেন। রাজধর্মের জয় হল।

মহম্মদ উফি এই ঘটনা লিখে মনের আবেগে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন ঃ—

"রাজা যদি ন্যায়পব হয়,
নাই হোক নিজে মুসলমান,—
তার রাজ্য হইবে নির্ভয়,
হবে নাক' কোন অকল্যাণ।"

মানবতার বিচারে হিন্দু মুসলমানে তফাত নেই।

নয়া হিন্দুস্থান যাঁরা তৈরী করছেন, তার নব সংবিধান যাঁরা করছেন তাঁরা সেই ন্যায়. সেই সর্বধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন।

হিন্দুস্থানের উপর যে অন্যায় সে যুগে হয়েছিল আজ শুধু সেই অন্যায়টুকুই মুছে দেওয়া হচ্ছে সোমনাথ নূতন করে স্থাপনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শুধু সে প্রতিষ্ঠাই ত' সব নয়।

গড়তে হবে নয়া হিন্দুস্থান. নতুন দেশ, নতুন ভক্তের দল, যাদের হৃদয়ে থাকবে ভক্তি কিন্তু বাহুতে থাকবে শক্তি, আর দেশ হবে যাদের কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী।

॥ ১০ ॥

ডাকাতেরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। একেবারে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্থানে।

উদ্দেশ্য অতি সাধু। চৌকীদার অভয় দিয়ে বলল যে, আমাদের প্রাণে মারবার কোন মতলব ওদের নেই। ওরা এরকম প্রায়ই করে থাকে। সাধারণত উট ভাগিয়ে পাকিস্থানে নিয়ে যায় পালে পালে। নিদেন পক্ষে ভারত আর পাকিস্থানের সীমান্তে অজানা 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ডে'। সেখানে জনমানবহীন জায়গাতে অনেক সুবিধা মত পোড়ো কেল্লা আছে। যার জানের কোন দাম আছে অর্থাৎ যে খোয়া গেলে অন্য কারো লোকসান হতে পারে এমন মানুষ পেলে উটের চেয়ে মনিষ্যিদের ওপরই ডাকাতের লোভ বেশী। কারণ তাতে 'র‍্যানসম' অর্থাৎ মুক্তিপণ অনেক বেশী পাওয়া যায়।

উটের চেয়ে মানুষকে আটকে রাখাও সহজ। খিদে তেষ্টায়, বিশেষ করে তেষ্টায় মারা যাবার ভয়ে ওই কেল্লা থেকে ভেগে তেপান্তরে পাড়ি দিতে আর যেই সাহস করুক, মানুষ করবে না।

কত টাকা দিলে ডাকাতরা ছেড়ে দিতে রাজী হবে তার দর কষাকষি হতে থাকে ততদিন।

হাতে হাতে তার প্রমাণও দেখে এসেছি স্বচক্ষে। আমাদের রেল লাইন মরুভূমির মধ্যে পাকিস্থানের দিকে এসে পোকরাণে শেষ হয়ে গেছে। সেই শেষ রেল স্টেশন থেকে মাইল পঁচাত্তর উত্তর-পশ্চিমে খাঁটি মরুভূমির ভিতর পাড়ি দিয়ে যশলমীর এসেছি। এ মরুতে একটুও ঘাস জল এমনকি একটা ঝাউ বা ঝোপের ভেজাল পর্যন্ত নেই।

শুধু একটা ভেজাল আছে। তাও আধুনিকতার কল্যাণে। আমি চলেছি। একটা জীপ গাড়িতে, উটের পিঠে নয়।

কিন্তু মরুভূমি তার খাজনা আদায় করতে ছাড়েনি। ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা সাতেকে পৌঁছে গেলাম বটে। কিন্তু কি ঝাকুনী রে বাবা। আমি কোনরকমে টিকে গিয়েছিলাম বটে। কিন্তু আমার সঙ্গী পঞ্চনদের বীর মদনলাল লম্বা

হয়ে বালিতে শুয়ে পড়ল। তার অন্নপ্রাশনের দিনের স্মৃতি ফিরে এসেছিল।

পথ বলে কিছু নেই। শুধু দূরে দূরে বালিয়াড়ীর চূড়োগুলো দেখা যায়। তাও একটা দমকা ঝড়ে পিল পিল করে বালির রাশি কোথা থেকে উড়ে গিয়ে কোথায় নতুন ঢিপি তৈরী করে তার ঠিক নেই। সরকার থেকে কিছু খোয়া আর পাথর বিছিয়ে একটা রাস্তা গোছের কিছু বানিয়েছিল বটে। কিন্তু মরুভূমি হাসতে হাসতে তার উপর বালির ঝড় বইয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছে। তার পর খোঁজ পথ, যে জান সন্ধান।

অবশ্য পথে আসতে আসতে দু'এক জায়গায় কাঠের ডান্ডায় লেখা আছে যে অত মাইল ভেতরে গেলে অমুক গ্রাম পাওয়া যাবে। এরকম একটা গ্রামের নাম লাঠি। মদনলালের ইচ্ছা যে সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করবে। ফিরে আসবার সময় আবার জীপে উঠিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু লাঠির দৌড় কতদূর তা জেনে সে তাড়াতাড়ি মত বদলাল। কষ্ট সওয়া সহজ। কিন্তু তা বলে ডাকাতের হাতে?

তা ছাড়া খেসারত দেবে কে?

লাঠির সর্দার কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে নিবেদন করল যে তার শ্বশুরকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে।

নয়া দিল্লীতে খানাপিনার পর এয়ার-কন্ডিশন ঘরে বসে আমেরিকানরা গল্প বলেছে যে, ওদের দেশে ডাকাতরা শাশুড়ীকে ধরে নিয়ে গুম করে রাখে। তারপর হুমকি পাঠায়—ভেজো দশ হাজার ডলার জলদি; না হলে এই দিলাম শাশড়ীকে ফেরত পাঠিয়ে। ভয়ে ভয়ে বড়লোক জামাই ডাকাতদের টাকা পাঠিয়ে দেয়। টাকা যাক, কিন্তু শাশুড়ী যেন ফেরৎ না আসে।

সেখানে নাকি মর্তলোকে মা সিংহবাহিনীর অবতার হচ্ছেন জামাইবাহিনী শাশুড়ী।

শুনে সবাই এমন হাসি হেসেছিলেন যে কোন দিন ভুলব না। কিন্তু আজ এই 'বানিয়া' বেচারার গল্প শুনে মদনলালের মুখ শুকিয়ে গেল। পেটে পাথর চাপা দিয়ে সে জীপের মধ্যেই কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

মহারাওল (মহারাজা) বাহাদুরের জীপ আমায় এনে তুলল খাস রাজপ্রাসাদে। চাঁপাফুলের রঙের মার্বল পাথরের প্রাসাদ। তার মিহি আর নিপুণ কারুকার্যের ছবি রাজস্থানের সব দ্রষ্টব্যের তালিকার মধ্যেই একেবারে উপরের দিকে ঠাঁই পেয়েছে। সেখানে ঠাঁই পেলাম আমি।

শহর আর কেল্লা থেকে মাইল দুই দূরে এই দোতালা রাজবাড়ি। ঝকঝকে ফার্নিচার আর দামী পুরু কার্পেটে ভরা। মহারাওলের প্রাইভেট সেক্রেটারী অতিথিকে আদরের কোন ত্রুটি করলেন না। কিন্তু একটু পরেই কোথায় যেন গা ঢাকা দিলেন।

সব খাবার মায় চা পর্যন্ত এল রাজবাড়ি থেকে। কিন্তু এবাড়ি নয়, কেল্লার গায়ে লাগান রাজবাড়ি থেকে।

বিকেল বেলা মহারাওল নিজে আর তার খুড়ো এলেন জীপে করে। সমস্তটা যশলমীর শহর—থুড়ি পোড়ো গ্রাম—ঘুরিয়ে দেখালেন। যত্ন করে দেখালেন কয়েক মাইল দূরে দূরে মহারাওলদের অমর কীর্তি চবুতরা আর মরুদ্যানগুলি। এই ওয়েসিসগুলির মধ্যে শুধু পুকুর নয়, পদ্মফুল পর্যন্ত আছে। আছে বেল চামেলী আব বাংলা দেশের আম। স্তরের পর স্তরে 'টেরাস' অর্থাৎ ধাপ ধাপ সিঁড়ি কাটা বাগান বাড়ি। মরুভূমির মধ্যে সত্যিই বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু শহরখানা মরুভূমি হয়ে এল। নতুন সরকার প্রথমে এটাকে কমিশনারের ডিভিসন বানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন একটা ছোট্ট মহকুমা মাত্র। কারণ ব্যবসা নেই বলে শহর উজাড় হয়ে যাচ্ছে। একদিন গজনী কাবুল ইরাণের ব্যবসা উটের পিঠে যশলমীর হয়ে ভারতে ঢুকত। আজ উটের পিঠে চড়ে হঠাৎ হামলা দেয় শুধু ডাকাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্যারাভ্যান নয়।

রাজধানীতে লোক নেই। রাজপ্রাসাদে নেই রাজা। তরুণ মহারাওল তার নতুন বিয়ে করা মহারাণী আর সামান্য প্রিভি পার্স অর্থাৎ রাজত্ব যাওয়ার দরুন খরচের টাকা নিয়ে কেল্লার পাশে পুরোনো রাজবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। তা হলে বড় নিঃসঙ্গ লাগে।

শুধু নিঃসঙ্গ নয়। নিরাপদ মনে করেন না—টিপ্পনী কাটল একজন যশলমীরী। হাল ফ্যাসানের প্যালেস যখন বানান হয় তখন মহারাজা রাজত্ব করতেন। আজ তিনি সরকারের সাধারণ প্রজা বইত কিছু নন। কাজেই যেখানে নিজের ধন সম্পত্তি আত্মীয় স্বজনকে নিরাপদে রাখতে খরচ কম হবে সেখানেই তিনি থাকবেন।

অবশ্য হাত পা ঝাড়া মেহমানের এই রাজবাড়িতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। পাকিস্থানের ডাকুরা (হিন্দুস্থানের ডাকুরাও ওদেশে বহাল তবিয়তে

আস্তানা গেড়েছে) শুধু স্থানীয় বানিয়াদেরই ভাল শিকার বলে মনে করে। তবে দরজা জানলা বন্ধ করে শোয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শিয়াল ডাকতে লাগল। শিয়াল ডানদিকে দেখে সীতা অমঙ্গলের চিহ্ন বুঝতে পেরেছিলেন। বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। কিন্তু আজ আমাদের চারিদিকেই শিয়াল। সে কথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু শিয়ালকে ভোলা সাধ্য কি? এই যশলমীরেও এক রাজা লক্ষ্মণ সেন একবার প্রত্যেক রাতে শিয়ালের চীৎকারে অস্থির হয়ে ওরা কেন রাতে কাঁদে তার খবর নিতে হুকুম করেছিলেন। পারিষদরা বলল যে, ওদের ঠাণ্ডা লাগে ব'লে ওরা চেঁচায়। তাতে হবুচন্দ্র রাজা ওদের তুলোর পোশাক বানিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন।

পোশাক যার গায়েই চড়ুক বা তার দামটা যার পকেটেই যাক, শিয়ালের রা থামল না। আবার লক্ষ্মণ সেন ওদের কান্নার কারণ শুধোলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেই ঠিক করলেন যে ওরা ঘরবাড়ি নেই বলে কান্নাকাটি করে। মরুভূমিতে অনেক জায়গাতেই ছোট ছোট কুঠরী বানিয়ে দিলেন। সুধী পাঠক, আপনি এটাকে নেহাত গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন না। এখনো এখানে সেখানে পাথরের ছোট কুঠরী দেখলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারেন যে, শিয়ালের আস্তানা খুঁজে পেয়েছেন। উড সাহেবও পেয়েছিলেন।

সেই রাজা যে কেল্লাটার মধ্যে বসে রাজত্ব করতেন, সেখানে মাত্র দুয়েকটা বাতি এখনো জ্বলতে দেখেছি। বাকী সব বাতি নিভিয়ে লোকেরা ঘুমোতে গেছে। আমিই শুধু জেগে আছি।

আলাউদ্দিনের পাঠান সৈন্যদলও এমনিভাবে রাতের পর রাত ওই কেল্লার বাতির দিকে চেয়ে থাকত। দোষ ওদের নয়। ওরা এসেছিল প্রতিশোধ নিতে। রাওল জৈৎসিংহের ছেলেরা গমের ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একটা খুব দামী ক্যারাভ্যানের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন দহরম মহরম করার পর সব লুট করে নিয়েছিল। তাতে পনের শ' ঘোড়া আর পনের শ' খচ্চর বোঝাই ধনরত্ন যাচ্ছিল আলাউদ্দিনের কাছে দিল্লীতে। এক ফোঁটা ধনরত্নও পাঠান সম্রাটের কাছে পৌঁছায় নি।

"ভাদ্র মাসের মেঘ এমনি করেই আকাশ ভরে আসে"—পাঠান সেনাদলের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন যশলমীরের চারণ কবি।

কেল্লার বাইরে নবাব মাবুব খান আস্তানা গেড়েছেন। কিন্তু কেল্লার পাঁচীলের মাথায় ছাপ্পান্নটা কোণার ঘাটি আগলাচ্ছে তিন হাজার সাতশ' ভাট্টি অর্থাৎ যশলমীর বীর। বাইরে মরুভূমির বালিয়াড়ির পিছন থেকে হঠাৎ হঠাৎ হামলা দেয় রাওলের ছোট ছেলের সৈন্যরা। পাঠানদের রসদ আনা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা শুধু আস্তানা গেড়ে দুর্গ ঘেরাও করে রাখল।

এদিকে রাওলের ছেলে রতন সিং মাবুব খানের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে ফেললেন। দুজনেরই এক রোগ—দাবা খেলা। সময় ঠিক করা আছে। রোজ সেই সময় লড়াই স্থগিত থাকে। কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসেন রাজপুত্র আর তাঁবু ছেড়ে এগিয়ে আসেন নবাব। দু পক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় গাছতলায় দুজনের হুকোবরদাররা দাবার ছক বিছিয়ে দেয়। শত্রুতা আর লড়াই ভুলে দুজনে খেলেন দাবা।

আট বছর ধরে এহেন লড়াই—হাতিয়ার আর দাবা, দুই নিয়েই—চলল। একেবারে রূপকথার ব্যাপার।

একদিন দাবা খেলতে এসে নবাব দেখলেন, রাজপুতদের মধ্যে খুব স্ফূর্তি আর গান-বাজনা চলছে? ব্যাপার কি? রতন সিং বললেন, তার বাবা মারা গিয়েছেন আর বড় ভাই মুলরাজের অভিষেক হচ্ছে। নবাব অভিনন্দন জানালেন। তার পর দুঃখ করে বললেন যে, গাছতলায় বসে দাবা খেলার দিনও ফুরিয়ে গেছে। আলাউদ্দিন হুকুম পাঠিয়েছেন যে, দুষমনের সঙ্গে দহরম মহরমের কথা তাঁর কানে পৌঁছেছে। এবার দাবা থামাও আর শুধু লড়াই চালাও। কাজেই দুজনে অনেক দুঃখের মধ্যে শেষবার চুটিয়ে সুখ করে দাবা খেলে নিলেন। আলিঙ্গন করে বললেন যে, পরের দিন ভোরে আবার তাঁরা মিলিত হবেন—মরণ আলিঙ্গনে।

ভাট্টি আর পাঠানে পরের দিন মারাত্মক লড়াই হল। এক দিনেই ন' হাজার সৈন্য হারিয়ে মাবুব খান তাঁবুতে ফিরে এলেন। আনালেন নতুন সৈন্য দিল্লী থেকে। এবার আরো জোর আক্রমণ চালাবেন।

এদিকে কেল্লার মধ্যে সৈন্য আর রসদ দুই-ই ফুরিয়ে এসেছে। মুলরাজ আর তাঁর সামন্তরা ঠিক করলেন যে, রাজপুতের শেষ উৎসর্গ করবার মত যা আছে, তাই, অর্থাৎ প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্য এবার শেষ যুদ্ধ করতে যাবেন।

কিন্তু পরের দিন ভোরে দেখা গেল, পাঠানরা আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কেল্লায় খুব আনন্দ উৎসব শুরু হল। যে মৌর অর্থাৎ

মুকুট পরে যমের বোন যমুনার সঙ্গে শেষ অভিসারে যাবার কথা, সে মৌর পরে তারা করলেন প্রেয়সীর সঙ্গে নতুন বিয়ের নতুন অভিনয়। তলোয়ারের ঝন্‌ঝনের বদলে সবাই শুনল নুপুরের ঝুনঝুন।

কিন্তু এই ফাঁকে নবাব মাবুব খানের ছোট ভাই যে কেল্লার কারাগার থেকে পালিয়ে উধাও হয়ে গেল, সে খবর কেউ রাখল না।

ক'দিন পরেই আবার ভাদ্র মাসের মেঘের দল যশলমীরের ছবির মত সুন্দর কেল্লার তলায় জমা হল। নবাব তাঁর ভাইয়ের কাছে জেনেছেন যে, রাজপুতদের আর সৈন্য বা খাবার বলতে বিশেষ কিছু নেই। ক'দিন আগে যে শেষ উৎসব স্থগিত হয়েছিল, সেটা এবার সেরে নিতে হবে।

রতন সিং বললেন—মেয়েরা সব চিতায় আত্মসমর্পণ করুন। আগুন আর জল দিয়ে যা নষ্ট করা যায়, সবই আমরা শেষ করে দেব। তারপর কেল্লার দরজা খুলে তলোয়ার দিয়ে কেটে কেটে স্বর্গের পথ বানিয়ে নেব।

মুলরাজ বললেন—লড়াইয়ে হাতীও তোমাদের রুখতে পারে না। আমার রাজসিংহাসনের সম্মান এই তরোয়াল রইল তোমাদের হাতে। শত্রুর উপর এরই আঘাতে আঘাতে যশলমীরে আলো জ্বলে উঠুক।

শেষ রাত্রিটুকু কাটল স্বজনের সঙ্গে মিলনে—চিরকালের জন্য মিলনের ভূমিকায়। রাজপুতানীরা বলেছিলেন—আজ রাতে আমরা তৈরী হয়ে নিচ্ছি। ভোরের আলোতে আমরা স্বর্গে চলে যাব। স্বামী ভাই ছেলেদের জন্য জায়গা ঠিক রাখবার জন্য একটু আগেই যাব।

চল্লিশ হাজার রাজপুতানী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেদিন। রাজপুতেরা খোলা তলোয়ার হাতে দেখল সে আগুন জ্বালা। আগুন রঙের পোশাক পরে, বিয়ের মুকুট মৌর মাথায় চড়িযে তিন হাজার আটশ' রাজপুত পরস্পর আলিঙ্গন করল। এত ভাল তারা আগে কখনো বাসে নি। তারপর চলল শেষ অভিসারে। নিজেরাই খুলে দিল দুর্গদ্বার।

চারণ কবি লিখেছেন,—"যুদ্ধের সমুদ্রে রতন সিং ডুবে গেলেন। কিন্তু তাঁর তরোয়ালের সামনে শুয়ে পড়ল একশ' কুড়িজন মীর। মুলরাজ বর্বরদের শরীরে বর্শা চালিয়ে চললেন। রক্তে মাটি ভেসে গেল।"

নবাব মাবুবও বীরপুজা জানতেন। তার ভাইকে রাজপুতেরা প্রাণে না মেরে শুধু বন্দী করে রেখেছিল। তাই তিনি যুদ্ধে জিততে পেরেছিলেন। তিনিও

প্রতিদানে রতন সিংহের ছেলেদের বাঁচিয়েছিলেন। যশলমীরের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

যশলমীরের কেল্লা আর কখনো শত্রুর হাতে হার মানে নি।

সেই কেল্লার শেষ বাতিটি এখন নিবে গেল। রতন সিং আর মাবুব খান কি এখন আবার গাছতলায় দাবার ছক নিয়ে বসবে রোজকার মত?

বিজলী বাতি আর পাখা এখন বন্ধ হয়ে গেল। মহারাওলদের রাজত্বের সময় সারা দিনরাত বিজলী পাওয়া যেত। রাজার খরচে বিদ্যুতের কারখানা বসান; যা কিছু লোকসান হয়, তা-ও রাজার। এখন গণতান্ত্রিক সরকার যে টাকাটা জনসাধারণের কাছ থেকে ফেরত পাবে না, সেটাকে লোকসান বলে ধরে। কাজেই বিজলীর কারখানা চলে মাত্র ঘণ্টা বার। রাত্রে মরুভূমির গরমে যদি হাঁসফাঁস কর, সে তোমার নিজের দোষ। এটা যে বৈশ্য যুগ।

কিন্তু বিজলীর ঝিলিক দেখেছি সারা সন্ধ্যাবেলা। মহারাওলের পূর্ব-পুরুষের তৈরী অমর সাগরের পারে। আজ ওদের ভাদোন্ উৎসব গেছে। রাজোয়ারার সবচেয়ে বেশী অনুর্বর মরুতে তৈরী হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর ফুল। বালির দেশে পাথরের ফুল। চোখ ঝলসিয়ে দেওয়া রোদের মধ্যে স্নিগ্ধ বাতাস আর আলো বাড়ির মধ্যে আসতে দেবার জন্যে আশ্চর্য সুন্দর পাথরের ঝিলমিল। এত সুন্দর যে হাতে খুদে করা হয়েছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

আজ সেই অদ্ভুত সুন্দর "হাভেলী"তে লোক নেই। যে দেশ এই সেদিনও সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখেছিল, সে দেশ এখন স্বপ্ন দেখে পাকিস্থানে চোরাই মাল আমদানি-রপ্তানির, দুঃস্বপ্ন দেখে ডাকাতি আর রাহাজানির। এক কালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমল বাপ্‌নার প্রাসাদ বোধহয় সবচেয়ে বড় আর সুন্দর। পুলিশ দারোগার লোহার নাল বাঁধাই নাগরার খটাখট আওয়াজে সেই হাভেলী এখন রোজ কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে। মাসিক ক্ষতিপূরণ অথবা বকশিষ মাত্র পঁচিশ টাকা।

সেই পড়ো আর ছেড়ে-আসা পাড়াগুলির ভিতর থেকে রঙীন সোনালি রূপালি চুণরী শাড়িতে ঝলমল করতে করতে বেরিয়ে এল রাজস্থানের রূপসীরা। শিরে গাগরী, চলন ভারী। জল নয়, বালির উপর দিয়ে তারা যেন রাজহংসীর মত লীলাভরে ভেসে আসতে লাগল। চলেছে তারা অমরসাগরে। না, না, স্বপ্নসায়রে।

পোশাকের অত রঙ, গয়নার অত বাহার, ফুলের এত মিছিল চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। চোখ বুজে কান পেতে রইলাম। ভুলে গেলাম রঙহীন সাদা-

মাটা বাঙগালী জীবনের কথা, নুন আর পান্তের সমস্যায় ঘেরা আটপৌরে দিনগুলি।

কালীরে কালায়ন উপড়ী এ পানিহারী হেলো
ওড়লা সা বরষে মেহ সোনেলো॥
মোটোরী ছোটোরী বরষে মেহ সোনেলো॥

কালো মেঘের ডাকে আমার পূব-বাংলায় মেঘনার কালো জলে বান ডাকা দেখেছি। আজ চোখ বুজে মরুভূমির বুকে সোনালি মেঘের আবাহন করলাম মনে মনে।

অমর সাগরের টলটলে বুকের উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হবে কি? ছোট আর মোটা বৃষ্টির ধারা ঝিমঝিম সুরে ঝরবে কি? বিরহিণীর করুণ ডাকে সাড়া দেবে কি?

পানিয়া ভরণের গানের পর ওরা গাইতে লাগলো 'উমর্‌লো'। ওগো আমার প্রিয়, বহুদূর থেকে মেঘ আসছে. বল কোথায় তারা ঝরবে। বল প্রিয়তম আমার, তুমিও কখন উটে চড়ে আসবে। ওগো, বিরাট কালো পাহাড়ের মত মেঘ উঠছে আকাশে, আর শিগ্‌গিরই বরফের মত সাদা হয়ে যাবে। ওগো প্যারে, তোমার ফিরে আসার সময় যে এলো। আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই সময় মত আসবে।... কচি সবুজ বাঁশ আনা হয়েছে মণ্ডপ বাঁধবার জন্য; সাজানো হয়েছে কলস। ওগো প্রিয়তম, তোমার কথা মত তুমি নিশ্চয়ই আসবে।.. ওগো মণ্ডপের মধ্যে চৌকী সাজানো হয়েছে আর চেরাগ দিয়ে তা সাজানো হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই আসবে।

আওয়েরে ঢোলো উমর্‌লো

গানের প্রত্যেক পদের শেষে করুণ রাগিনীতে গেয়ে উঠতে লাগল তারা—

আওয়েরে ঢোলো উমর্‌লো।

উজ্জয়িনীর পাহাড়ের চূড়া থেকে, বাংলা দেশের তমাল বন থেকে মেঘের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে কবিরা যুগে যুগে। জনহীন মেঘহীন মরুভূমি যশলমীরের বিরহিণীদের মুখেও সেই নিমন্ত্রণ ধ্বনিত হচ্ছে।

কালিদাস একা নন, ঘরে ঘরে আমরা ক্লান্ত অকবির দলও মর্মে মর্মে বুঝি—মেঘালোকে, মেঘ দেখে মন আনমনা হয়ে যায় — প্রেয়সী পাশে থাকলেও! আর তিনি যদি থাকেন দূরে, বহুদূরে? এই দুস্তর মরুর ওপারে? আরো, আরো অনেক দূরে?

প্রেয়সী যদি থাকেন ওই দূর দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়? কেল্লার মধ্যে

জানলার পাশে বসে আছেন বিরহিণী আঁধার রাতে বাতি জ্বালিয়ে। প্রিয় আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যাকুল বেগে। চাইবে নিচের সমতল ভূমি বন-জংগল থেকে আকাশের তারাগুলির পানে। তার মাঝে নিজের বাতায়নের পাশে একটি দীপশিখা আর দুটি আঁখিতারাকে খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু যদি মিলন না হয়? বিরহ-সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যদি দুজনে দুজনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?

আঁধার রাতে আজ আকাশে কয়েকটি তারা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘুমও নেই আমার চোখে। রোমিও জুলিয়েটের আত্মা হয়ত আকাশে তারা হয়ে চিরকাল বিরহী বিরহিণী হয়ে আছে। পৃথ্বীরাজ আর তারাবাঈও নিশ্চয়ই এমন ভাবেই আছেন। বীর প্রেমিক পৃথ্বীরাজ আর বেদনোর শহরের তারা, তারাবাঈ।

রাণা রায়মল্লেলর তিন ছেলে আর ছোট ভাই পাহাড় বেয়ে উঠছেন চারণী দেবীর মন্দিরে। সংগ, পৃথ্বীরাজ আর জয়মল্লের মধ্যে কে যে পরে রাজা হবে, সে কথা তিনজনেরই মনে আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। সঙ্গ বড় ছেলে। বাপের পর মেবারের সিংহাসন তাঁরই পাবার কথা। (তিনি তা পেয়েছিলেন ও বাবরের সংগে লড়েছিলেন)। কিন্তু তিনি একটু হিসাবী আর সাবধানী। পৃথ্বীরাজ হচ্ছেন বেপরোয়া। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অস্থির আর সেজন্য তাঁর শিক্ষা আর সাহসের শেষ নেই। আর জয়মল্ল?—তা, ছোট ছেলে বলে কি সিংহাসন পাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে না? খুড়ো সূর্যমল্লেরও নজর সেদিকে আছে।

খুড়ো আর ভাইদের পৃথ্বীরাজ বোঝাচ্ছিলেন যে, দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল ভাবে লড়বার জন্য তাঁরই রাজা হওয়া উচিত। সঙ্গও দেশকে কম ভালবাসেন না। বললেন—বেশ ত, ভগবান যাঁকে সবচেয়ে বেশী কাজের বলে মনে করবেন তাঁকেই মেবারের রাণা করবেন। আমি বড় হলেও দাবি ছেড়ে দিতে রাজী আছি। বাঘ পাহাড়ে চারণী দেবীর মন্দিরে গিয়ে পুজারিণীকে জিজ্ঞাসা করা যাক।

পুজারিণী মন্দিরের গুহাতে ছিলেন না। কাজেই ওঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। পৃথ্বীরাজ আর জয়মল্ল বসলেন পুজারিণীর বিছানার উপর আর সঙ্গ বাঘছালের উপর। সূর্যমল্ল বসলেন মাটিতে, একটি হাঁটু বাঘছালের উপর রেখে।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে অর্জুন আর দুর্যোধন দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্যোধন

এসে বসলেন তাঁর মাথার কাছে। আর অর্জুন পায়ের কাছে। সেই বসার ভঙ্গির মধ্যে ছিল নিয়তির ইঙ্গিত। যিনি পায়ের কাছে বসেছিলেন, আসল সাহায্য ভিক্ষা ত' তিনিই করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে দেখতে পেলেন অর্জুনকে। প্রথম সাহায্য বেছে নিতে দিলেন তাঁকেই।

পুজারিণী গুহায় ফিরে এলেন। পৃথ্বীরাজ সব কাজেই আগুয়ান। হুড়মুড় করে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য খুলে বললেন। কিন্তু পুজারিণী সঙ্গের দিকে ফিরে তাকালেন। বাঘের ছাল হচ্ছে আদ্যিকাল থেকে রাজার আসন। তুমি যখন বাঘছাল বেছে নিয়েছ ভবিষ্যতে মেবারের রাণা হবে তুমিই।

পাশেই বসে সূর্যমল্ল। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আর তুমি যে একটি হাঁটু বাঘছালের উপর রেখে বসে আছ, তুমিও ভবিষ্যতে একটুকরো রাজ্য পাবে। তবে অনেক দুঃখ, অনেক লড়াইয়ের পর।

লড়াই বেধে উঠল তখনি। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পৃথ্বীরাজ তখনি সঙ্গকে মেরে ফেলতে উঠলেন। কিন্তু মাঝখানে এসে পড়লেন খুড়ো। বেঁচে গেলেন মেবারের ভাবী রাণা। একটা চোখ গেছে, আর সারা গায়ে ঝরছে রক্ত।

না, তবু রক্ষা নেই। পৃথ্বীরাজ আর সূর্যমল্ল লড়াইয়ের চোটে জখম হয়ে পড়ে রইলেন গুহাতে। কিন্তু জয়মল্ল তাঁর সঙ্গী-সামন্ত নিয়ে তেড়ে চললেন সঙ্গকে। একজন রাঠোর একটি মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সঙ্গ তাকে পরিচয় দিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রাঠোর তাঁকে আশ্রয় দিলেন, কিন্তু যতক্ষণ না সঙ্গ পালিয়ে যেতে পারেন, ততক্ষণ একা তরোয়াল হাতে জয়মল্লের দলের সঙ্গে লড়লেন। আশ্রিত বেঁচে গেল কিন্তু রাঠোরকে প্রাণ দিতে হল।

হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে বীরত্বে সবচেয়ে বেশী বড় ছিল মেবার। চারপাশে মুসলমান শত্রুর রাজ্য। তারা একে একে হিন্দু রাজ্যগুলি গ্রাস করছে, উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথে আসছে তৈমুর-বাবরের আক্রমণ। তবু এই মেবারের রাজপুত্রদের মধ্যে ভায়ে ভায়ে মারামারি। সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি। কাজেই হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়?

রাণার কানে সব খবর এল। তিনি পৃথ্বীরাজকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। লড়াই যখন এতই ভালবাস, যাও লড়াই করেই খাও গিয়ে।

নরওয়ে দেশের ডাকাত ভাইকিংদের এই রকম ব্যবস্থা ছিল। সব জোয়ান ছেলেকেই নিজে করে খেতে হ'ত। বড় হয়ে যেই ঘরে গোলমাল সৃষ্টি করতে শুরু করত, তাদের বাইরে খেদিয়ে দেওয়া হ'ত। নিজের ব্যবস্থা তখন থেকে

নিজের হাতে। বাঙ্গালী জমিদার ঘরের মত নয় যে, পৈতৃক কিছু আছে, অতএব সেটুকু ভাগাভাগি করেই দিন চালাতে হবে। অথচ এদিকে কয়েক বছরের মধ্যে তালপুকুরে ঘটি ডোবে না।

পৃথ্বীরাজ করে খেতে লাগলেন। কাজ হচ্ছে একটার পর একটা পরগণা গায়ের জোরে দখল করে নিজের নাম বাড়ান। আর বাপের রাজত্ব।

মেবারের বেদনোর শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন টোডার রাজা। পাঠানরা তাঁকে রাজ্যহারা করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বার বার চেষ্টা করেও নিজের রাজ্য ফিরে পাচ্ছিলেন না। বহু রাজপুত বীর তাঁর হয়ে লড়েছিল। কারণ যে টোডা জয় করতে পারবে, রাজা তার সঙ্গেই রাজকুমারী তারাবাঈয়ের বিয়ে দেবেন। তারাবাঈ অন্দরে বসে রান্না আর সেলাই আর সংসারের সেবা নিয়ে বসে ছিলেন না। তরোয়াল হাতে দামাল ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতেন। তাঁর হাতের বর্শা আর চোখের চাহনি সমান ঝিলিক হানত। রূপের জন্য তাঁকে সবাই বলত বেদনোরের তারা।

জয়মল্ল টোডারাজের কাছে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু উত্তর দিলেন তারাবাঈঃ যে আমার বাবার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে, শুধু তাঁকেই দেব বরমাল্য। শুধু বসুন্ধরাই বীরভোগ্যা নয়। নারীও।

জয়মল্ল কথা দিলেন যে, তাই করবেন। দেখতে এলেন তারাবাঈকে। পেলেন তাঁর পরিচয়, আর সঙ্গ। কিন্তু আফিমের ঝোঁকেই হোক বা তার চেয়ে কড়া যৌবনের নেশাতেই হোক মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। টোডারাজের তরোয়ালে তাই মাথা হারাতে হল।

পুত্র হত্যার প্রতিশোধ চাই। মাথার বদলে চাই মাথা। মেবারের সামন্তরা গরম হয়ে উঠলেন। রাণাকে ক্রমাগত উস্কোতে লাগলেন। কিন্তু রাণা মাথা নাড়লেন। যে অসহায়া নারীকে অসম্মান করে, আশ্রিতকে দেয় না মর্যাদা, তার মরাই উচিত। শুধু তাই নয়, এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। বেদনোরের জায়গীর আমার পুত্রহন্তাকেই দিলাম।

ভাই এমনভাবে মরল। বাপ প্রায়শ্চিত্ত করল এমনভাবে। আর সবার উপরে তারাবাঈয়ের এত রূপ। এতেও যদি পুরুষত্ব না জেগে ওঠে, তবে সে কেমনতরো রাজপুত?

পৃথ্বীরাজ কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে নিলেন।

সোজা বেদনোরে এসে একেবারে তারাবাঈয়ের পাণি প্রার্থনা করলেন।

হবে কি তুমি আমার সহধর্মিণী?

তুমি কি আমার বাবাকে টোডা ফিরিয়ে দিতে পারবে?

পারব। রাজপুতের দিব্যি দিয়ে বলছি, নিজের কসম খেয়ে বলছি, পারব।

আচ্ছা, তবে তাই হোক। হলাম তোমার সহধর্মিণী। এবং সহকর্মিণীও।

দুজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চললেন টোডা জয় করতে। বাহুতে তুমি যে শক্তি। সেই শক্তি চলেছেন জীবনমরণ কী সাথী হয়ে। যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী। আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিণী।

টোডা শহরে খুব উৎসব চলছে। মিছিলে মিছিলে লোক একাকার। উপরের ঝুল বারান্দা থেকে পাঠান দেখছেন লোকের ভিড়, পরে নিচ্ছেন দরবারের পোশাক। এমন সময় নজরে পড়ল যে দুজন ভিনদেশী পোশাক পরা লোক সেখানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এরা কারা? কোন সুদূরের বিদেশী?

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পেতে হল না। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ধনুকের ছিলা টঙ্কার দিয়ে কেঁদে উঠল। একটা বর্শা শনশন করে বাতাস ফুঁড়ে উপরে ছুটে এল। বারান্দায় গড়িয়ে পড়ল সুবাদারের মৃতদেহ।

চারদিকে মহা হৈ চৈ। কি ব্যাপার? কি করে হল? দুষমণরা ক' হাজার লোক? মেবারের রাণা হামলা করল নাকি?

কিন্তু কে দেয় জবাব, আর কে করে খবর? সবাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ততক্ষণে বীর দম্পতি চলেছেন শহরের দরজার দিকে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাজপুত সৈন্যদল।

পাঁচিলের দরজার সামনে একটা হাতী শুঁড় তুলে রুখে দাঁড়াল, নিমেষে একটা তলোয়ারে ইস্পাতের বিদ্যুৎ খেলে গেল। শুঁড় ধড় থেকে কেটে গড়িয়ে পড়ল। হাতী পালাল পথ ছেড়ে। তারাবাঈ নিজে হাতে ফটক খুলে দিলেন। জয় বেদনোরের তারাব জয়।

আজমীরের সুবাদার তৈরী হতে লাগলেন এই হারের শোধ নেবার জন্য। কিন্তু আগে থেকে নিজে হামলা করাই আত্মরক্ষার সবচেয়ে ভাল পথ। চিরকালের যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে এই। পৃথ্বীরাজ রাতারাতি দলে বলে চললেন আজমীরে। ভোর না পোয়াতে আজমীরের কেল্লার চূড়ায় রাজপুতের নিশান পৎ পৎ করে উড়তে লাগল।

এ দিকে বুড়ো রাণার মন ভেঙে গেছে। বড়ছেলে সংগ নিখোঁজ; ছোটছেলে জয়মল্ল নেই। এক আছে পৃথ্বীরাজ। সে ত' নির্বাসনে। অথচ তার জয়গানে,

পুত্রবধূর রূপ আর বীরত্বের গাথায় রাজস্থান ভরে উঠেছে। তিনি ছেলেকে ফিরে আসতে নিমন্ত্রণ করলেন।

পৃথ্বীরাজের বাপের সঙ্গে আর কোন মনকষাকষি রইল না। কিন্তু তা বলে কি তিনি রাজপুত্রের মত আরামে রাজপ্রাসাদে দিন কাটাবেন? মেবারের পশ্চিম দিক থেকে আসে দিল্লীর হানা, মালবের সুলতানের আক্রমণ। তিনি পশ্চিম সীমান্তে কমলমীরে নতুন কেল্লা বানালেন। একটার পর একটা সারি সারি যুদ্ধের দেওয়াল, তাতে গুলী ছুঁড়বার ঘুলঘুলি। পাহারা দেওয়ার গুমটিঘর সবই বসান হল। আর সবার উপরে একেবারে চূড়ায় তৈরী হল তারাবাঈয়ের মেঘমহল।

রাজ্যের সীমান্তে হঠাৎ হঠাৎ হানা দিত ডাকাত আর লুঠেরার দল। বিচার-ব্যবস্থা ভাল ছিল না। পৃথ্বীরাজ সেখানে শান্তি আর ন্যায়ের রাজত্ব ফিরিয়ে আনলেন, য়্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে দলে দলে রাজপুত নানা দেশ থেকে তার দলে এসে যোগ দিল। চারণকবি গেয়েছেন যে, "তাদের তরোয়াল আকাশে ঝকমক করত আর পৃথিবীতে সবাই ভয় করত। কিন্তু যাদের রক্ষা করবার কেউ নেই তাদের সাহায্য করত।" রবিন হুডের রাজ সংস্করণ।

এ দিকে সূর্যমল্ল বিদ্রোহ করে বসলেন। পূজারিণীর ভবিষ্যৎ বাণী তিনি ভোলেননি। রাজা তাকে হতে হবেই। তাই মালবের সুলতানের সাহায্য নিয়ে তিনি লুটপাট করতে করতে মেবারের বেশ খানিকটা দখল করে ফেললেন। রাণার সঙ্গে যুদ্ধ হল। ব্যাপার বেগতিক দেখে রাণা নিজে সাধারণ সিপাইয়ের মত লড়ে গেলেন। তবু ওদের বেদম হার হত যদি না পৃথ্বীরাজ হঠাৎ শেষ মুহূর্তে নিজের রবিন হুডের দল নিয়ে হাজির হতেন।

রাত আঁধার হয়ে যাওয়াতে যুদ্ধ মুলতুবী রইল সেদিনকার মত। কিন্তু দু দলেরই শিবিরে জ্বলছে আলো। কখন আবার ভোর হবে, আবার শুরু হবে লড়াই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ বেপরোয়া ভাবে হাটতে হাটতে চলে এলেন একেবারে সূর্যমল্লের তাঁবুতে। খুড়োর গায়ের সব জখম নাপিত সেলাই করে দিয়েছে। তিনি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে পৃথ্বীরাজ। ভয়ে আঁৎকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন সূর্যমল্ল। এত হঠাৎ, এত জোরে যে জখমের সেলাইগুলি সব ছিঁড়ে গেল। আবার রক্ত পড়তে লাগল।

কিন্তু পৃথ্বীরাজ হেসে অভয় দিলেন। আমি নিশুতি রাতে চোরের মত মারতে আসিনি। আপনি ভাল ত'?

খুড়োও কম যান না। বললেন,—বাবা, তোমায় দেখেই আমি ভাল হয়ে গেছি। কোন কষ্ট আর নেই।

কিন্তু, কাকা, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমার একটুও তর সইল না। লড়াইয়ের পর বাবার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত দেখা করিনি। এমন কি খাইনি পর্যন্ত, এখন কিছু খেতে দাও আমায়।

খাবার এল। যারা সারা জীবন পরস্পরের মরণ চেয়েছেন—মনে মনে আর মারামারিতেও—তারা একসঙ্গে বসে এক থালা থেকে খেতে লাগলেন। যেন এত বড় বন্ধু আর হয় না।

সকালেই আমাদের লড়াইয়ের এস্পার ওস্পার করে নেওয়া যাক্—এই বলে পৃথ্বীরাজ বিদায় নিলেন।

খুড়ো জবাব দিলেন,—সেই ভাল বাছা। একটু তাড়াতাড়ি এসো।

পরের দিন সূর্যমল্লেব বেধড়ক হার হল। কিন্তু পৃথ্বীরাজের তলোয়ারের ছোঁয়া তার গায়ের উপর পড়ল না। বনে পালিয়ে গাছপালা দিয়ে লুকোবার ঠাঁই তৈরী করে নিলেন। আশা করলেন যে শত্রুপক্ষ আর তার নাগাল পাবে না। কিন্তু একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ডাল লতা পাতার বেড়াগুলি মড়মড় করে আওয়াজ করে উঠল। সূর্যমল্ল চেঁচিয়ে উঠলেন—এ নিশ্চয়ই আমার ভাইপো। তাছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হাতে তলোয়ার তুলে নিতে না নিতেই পৃথ্বীরাজের তলোয়ারের একঘায়ে সেটা খসে পড়ে গেল।

সূর্যমল্ল যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করলেন। বললেন,—আমি যদি মরি কিছু আসে না। আমার ছেলেরা রাজপুত। তারা আবার লড়তে পারবে; শোধও নিতে পারবে। কিন্তু বাবা তুমি যদি মর, তা হলে চিতোরের কি হবে?

শেষ পর্যন্ত চিতোরের ভবিষ্যৎ ভেবেই সূর্যমল্ল এই শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তারই এক বংশধর, দেওলার রাজা, আকবরের চিতোর জয়ের সময় কাপুরুষ রাণার বদলে নিজের মাথায় রাজচ্ছত্র নিয়ে লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছিলেন।

একটি নারীর কাতর মিনতি এখন পৃথ্বীরাজের মনকে নাড়া দিল। তার নিজের এক বোনের বিয়ে হয়েছিল সিরোহীর রাজার সঙ্গে। মাউণ্ট আবুর মত সুন্দর জায়গা মেবার জামাইকে যৌতুক দিয়েছিল। তবুও জামাই নববধূর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে। আফিম খেয়ে বা মাতাল হয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার অনেক স্বামীর বীরত্বের প্রমাণ হয়ে আছে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই

এ হেন বীরপুরুষরা স্ত্রীকে চুল ধরে হেঁচড়িয়ে বিছানা থেকে নামিয়ে পালঙ্কের নীচে মেঝেতে ফেলে রাখে।

সিরোহীরাজ আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে আর তার স্ত্রী খাটের নীচে। এমন সময় বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিরাট লম্বা মূর্তি। মাঝরাতে রাজবাড়ির দেওয়াল বেয়ে সিপাইসান্ত্রীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পৃথ্বীরাজ এখানে এসে পেঁছেছেন। কিন্তু স্বামীর গলার কাছে ছোরা দেখে স্ত্রী ভাইয়ের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করলেন। রাজার তখন ভয়ের চোটে নেশা উধাও হয়ে গেছে। স্ত্রীর জুতো নিজের মাথার উপর রেখে স্ত্রীর পা ছুঁয়ে আর কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না এই প্রতিজ্ঞা করতে হল। প্রাণে রক্ষা পেলেন তিনি।

এর পরে পৃথ্বীরাজ ভগ্নীপতিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক যেমনভাবে পরাজিত শত্রুকে তিনি করতেন। যে রাজপ্রাসাদে চোরের মত ঢুকেছিলেন সেখানে রাজার মত সম্মান পেলেন। অনেক দিন সেখানে থাকতে হল তাকে। মেবারের যুবরাজ আর রাণীর ভাই। কত আনন্দ উৎসব হল।

বিদায় নেবার সময় ঘোড়ায় উঠতে যাবেন এমন সময় সিরোহীরাজ নিজে হাতে পৃথ্বীরাজকে কিছু মিঠাই দিলেন। মিঠাইয়ের জন্য সিরোহীর খুব নাম ডাক আছে। আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরাও যাবার দিন হাঁড়িতে কটি মিষ্টি দিয়ে দেন রাস্তায় খাবার জন্য। পথে যেন তোমার খাবার কষ্ট না হয়, অসুবিধা না হয়। আর লক্ষ্মীটি, আমার কথা মনে রেখো।

সম্মুখ সমরে যিনি সর্বদা ধর্মযুদ্ধ করেছেন, শত্রুর হাতে খানা পিনাকে তিনি সন্দেহ করবেন কেন? সিরোহীর মিঠাই খেতে খেতে তিনি চললেন। কিন্তু কমলমীরে তাঁকে পেঁছাতে হল না। যে পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে কমলমীরের গিরিবর্ত্ম দেখা যায় সেখানে এসে তাঁর বুক ধুক ধুক করতে লাগল। তারাবাঈকে তখনি তিনি খবর দিয়ে পাঠালেন। তারা তখন অপেক্ষা করছিলেন মেঘমহলের বাতায়নে। দূরে বহুদূরে স্বামীকে দেখতে পাবেন গিরিবর্ত্মে ঢোকার সংগে সংগেই। তারাবাঈ চোখ মেলে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন। পৃথ্বীরাজও মুদে আসা চোখ কোনমতে টেনে রেখেছেন। একবার বেদনোরের তারাকে শেষবারের মত দেখে যাবেন।

শেষ দৃষ্টি বিনিময় আর হল না। কিন্তু বীর নারীর গানে গানে যে আকাশ ভরে আছে তার নিচে তারা ভরা রাতে আমি একা নই। একা নই।

॥ ১১ ॥

দেখুন কি চমৎকার মিহি ছুঁচের কাজ। যেন মেশিনে বানানো হয়েছে। একেবারে বেলজিয়ামে—যেখানে দুনিয়ার সব্‌সে সেরা লেস তৈরী হয়।

একবার আনন্দ সিংয়ের মুখের দিকে তাকালাম। একবার জিনিসটার দিকে। কত মমতা দিয়ে তিনি হাত রেখেছেন লেসটাতে। মুখে তাঁর কত খুশী খুশী ভাব।

ব্যাপারটা সবই বুঝলাম। গিন্নীর হাতের তৈরী নিশ্চয়ই। কালিদাস না হয় নেই একালে। কিন্তু কিছু উপমা ত' দিতেই হবে। না হলে ঠাকুর সাহেবের কাছে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মান থাকে না। কিন্তু কি বলি, কি বলি?

চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। বললাম—বাঃ, কি চমৎকার কাজ। ঠিক আড়াই দিন কা ঝোপড়ার মত।

ভদ্রলোক একটু চোখ তুলে তাকালেন। কি জানি হয়ত প্রশংসাটা অবিশ্বাস করছেন। অথবা অত প্রকান্ড একটা শ্বেত পাথরের ধর্মস্থানের সঙ্গে তুলনাটাকে উনি 'লেগ-পুলিং' অর্থাৎ ঠাট্টা মস্করা বলে মনে করছেন। তাই একটু টীকা করতে হল।

সামান্য ছুঁচ আর সুতো দিয়ে শ্রীমতী আনন্দ সিং এমনি একখানা সুন্দর জিনিস বানিয়েছেন। এর একমাত্র তুলনা হচ্ছে আড়াই দিন কা ঝোপড়ার পাথরের জালির কাজ। প্রথমে ছিল একটি পাঠশালা। কিন্তু টড আর কানিংহামের মতে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের এত বড় সুন্দর নমুনা আর নেই। পৃথিবীতে যত সুন্দর প্রাচীন প্রাসাদ আছে তাদের যে কোনটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এ যেন পাথরের বাড়ি নয়। জমকালো চোখ ধাঁধানো কারুকার্যে ভরা একখানা জড়োয়া গয়না।

না। না। আপনি একটা সামান্য লেসের সম্বন্ধে এ কী বলছেন। এ যে ভীষণ বাড়িয়ে বলা হল। প্রতিবাদ করে বললেন আনন্দ সিং।

কেন? অত বড় আর অত সুন্দর পাঠশালার রাজবাড়িখানা যদি আড়াই

দিনে ভেংগে মসজিদ তৈরী করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কি বাড়িয়ে বলেছি?

তা, দেখুন বাড়িয়ে বলাটা আমাদের দেশে একটা ন্যাশনাল আর্ট। জাতীয় শিল্পকলা।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—মনে আছে ঝোপড়ার ভাংগা পাথরে খোদাই করা প্রশস্তিটা? তাতে লেখা আছে যে, আজমীরের (অজয়-মেরুর) রাজা অজয়দেবের ছেলে আজমীরের মাটি তুরস্কদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। আর কেমন পুরোপুরি লাসে লাল হয়ে গিয়েছিল তাও লেখা আছে। ঠিক যেমনভাবে যুদ্ধ জিতে স্বামী ফিরে এলে স্ত্রী লাল কুমুম্ভ রঙের বেশভূষা করে।

ঠাকুর আনন্দ সিংহের সে কথা খুবই মনে আছে। আরো একটা উদাহরণের কথা তাঁকে জানালাম।

দিল্লীতে কুতব মিনারের পাশে মরচেহীন ক্ষয়হীন লোহার স্তম্ভে তার আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কারিকরের নাম নেই। তার বদলে আছে এমন একজন রাজার নাম যাঁর কথা ইতিহাসের কোন পাতায় পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর বীরত্বের বর্ণনার ঘটাখানা দেখুন একবার। তাঁর ক্ষমতার হাওয়ার চোটে দক্ষিণ সাগর এখনো খোসবুয়ে ভরে আছে। তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

অবশ্য হিন্দু পাঠান মোগল সব পুবদেশীদেরই এই রোগটা সমানভাবে ছিল। এই ঝোপড়াতেই সুলতান আলতামসের বর্ণনা হচ্ছে যে, তিনি পৃথিবীর রাজা, মানুষের শ্রেষ্ঠ মাথার অধিকারী, আরব আর পারস্যেরও রাজা। শুধু পৃথিবীটুকু নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হন নি। তিনি ছিলেন এ জগতে ঈশ্বরের ছায়া। আর ধর্ম ও পৃথিবীর সূর্য।

এই আজমীরেই তারাগড় পাহাড়ের পশ্চিমে খুব সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চশমা উপত্যকা। সেখানে জাহাংগীর চশমা-ই-নুর নামে একটি মহল বানিয়েছিলেন। তাতে লেখা আছে যে, তিনি সপ্তলোকের রাজা, চিত্রগুপ্তের খাতায় তাঁর সব গুণ লিখবার মত জায়গা নেই। (হায়! সে খাতাখানিতেও হয়ত দোষগুণ লিখবার জন্য পাতার র‍্যাশন করা আছে)। শুধু তাই নয়। তিনি যখন এই জায়গাতে ঝরণার পাশে এলেন তাঁর দয়ায় হঠাৎ জল বইতে শুরু হল আর সেখানকার ধুলো পর্যন্ত পরশমণি হয়ে গেল।

আজো ঠিক এমনি করেই মানুষের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়াতে চড়াতে

সেটাকে আমরা এমন গরম করে তুলি যে, সত্যিকারের বড় মানুষরাও স্তাবকদের হাতেই নষ্ট হয়ে যায়। খোসামোদে দেবতারাই ভুলে যায়। মানুষ ত' কোন্ ছার। প্রাচ্যের এই প্রাচীন বিষ যে কি সাংঘাতিক চীজ তা বুঝতেন বলেই মহাত্মা এই নামে গান্ধীজী খুশী হতেন না।

খোসামোদ করতে গেলেই বাড়িয়ে বলতে হবে। কে বলে শুকনো কথায় চিড়ে ভেজে না? আরে মশায়, কথায় মন পর্যন্ত গলে যায়।

তাই নাকি?

বেশ একটা বসন্তের আমেজ দিয়েছে বাতাসে। মরুভূমির নির্জন দেশে আজমীর একটা বেশ বড় শহর। তার মধ্যে আবার আনা সাগরের আশে-পাশে একেবারে ওয়েসিস অর্থাৎ মরূদ্যান। এহেন জায়গায় ঠাকুর আনন্দ-সিংহের মত সুরসিক লোকের অতিথি হয়েছি। বসন্তের আমেজ ত' এমনিতেই বইবার কথা। হাসিমুখে বললাম—বাঙালী কবিরা মনের দুঃখে গেয়েছেন—

"ও তোর মনের নাগাল পাইলাম না"।

অথচ আপনি বাহাদুর লোক, শুধু কথাতেই মন গলিয়ে দিতে পারেন?

ভদ্রলোক কথাটার মধ্যে যেন একটা যুদ্ধং দেহি গোছের চ্যালেঞ্জের গন্ধ পেলেন। একটু গম্ভীর হয়ে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। যেন তলোয়ারে শান দিচ্ছেন। রাজপুত ত'।

না, মশায়রা, হাসবেন না। জানেন ত' গোঁফ আর তলোয়ার দুই-ই রাজপুতের বড় হাতিয়ার, বীরত্বের জবর নিশানা। আপনি যদি খাঁটি রাজপুত হন তাহলে গোঁফে হাত রেখে হলফ করলেই হবে। দিব্বি গালতে হবে না।

গোঁফে তা দিতে দিতে ফেলে আসা দিনের পাতাগুলো সরে গেল। আনন্দ-সিং ফিরে এলেন তার মেয়ো কলেজে পড়ার মাতাল করা গোঁফহীন দিনগুলিতে। মরুভূমির মাঝখানে এক অজ্ঞাত 'ঠিকানা' (জায়গীর) থেকে সেকেলে বাপ টাকা পাঠায় ভারী হাতে। ছেলে চীফ কলেজে লেখাপড়া করে। সাহেবী কায়দায়। সাহেবী শিক্ষার সঙ্গে একটি সাহেবী রোগও তাকে ধরল। রাজপুত মাতব্বররা নাকি এ বস্তুটিকে রোগ বলেই মনে করেন।

অর্থাৎ ঠাকুর আনন্দসিং প্রেমে পড়লেন। তাও বিলেতী কায়দায়। একটি আধা বিলেতী তরুণীর সঙ্গে। এখানকার রেলোয়ে ওয়ার্কশপের কল্যাণে এরকম তরুণীর অভাব নেই আজমীরে।

ঠাকুর সাহেবের সেই সযত্নে কামানো ঠোঁটের উপর আজ জাঁকালো গোঁফ ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আধুনিক সেই প্রেমের নেশা গেছে ছুটে স্বপ্ন গেছে টুটে। কিন্তু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন যে, বিলেতী আধা বিলেতী ছোকরাদের সংগে প্রেমের ঘোড়দৌড়ে পাল্লা দেবার জন্য তিনি এমন একটা রাস্তা বের করে নিয়েছিলেন যে, তার ধার কাছ দিয়েও তারা ঘেঁষতে পারেনি। এমনি রঙ ফলিয়ে তিনি মেয়েটির রূপ গুণের তারিফ করে যেতেন যে সে বেচারী যে হেলেন অব ট্রয় থেকে পদ্মিনী অব চিতোর পর্যন্ত সবার চেয়েই বেশী রূপসী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

আপন মনে টিপ্পনী কাটলাম—বিউটি ইজ দি লাভার্স গিফ্ট—রূপ হচ্ছে প্রেমিকের উপহার।

মাথা নাড়লেন ঠাকুর সাহেব। উঁহুঃ ঠিক হল না। রূপ হচ্ছে চোখের নেশা; কিন্তু তার রস যোগাচ্ছে মুখের ভাষা। সেখানেই প্রেমিকের চেয়ে আপনারা সাহিত্যিকরা বেশী সুবিধে করতে পারেন।

অর্থাৎ সাহিত্যিকরা প্রেমের খেলায় নামলে বাজার মাৎ করতে পারবেন? বলতে বলতে সুন্দর-কাজ-করা জার্জমিরী নাগরা জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে নিলাম। যেন সাহিত্যিকদের এই তাজা সুসংবাদটা এখনি জানানো দরকার। জুতোজোড়াও আজ সকালেই কিনেছিলাম।

তা মোটেই অসম্ভব নয়,—আশ্বাস দিলেন ঠাকুব সাহেব। আর একটু ফোড়নও দিলেন—যদি অবশ্য কলমের মত জিভেরও জোর থাকে।

ওই ত গোলমাল করলেন আপনি—খুব একটা আশাভঙ্গের ভাব দেখিয়ে বললাম। কোন জায়গাতেই যখন জোর থাকে না, তখনই কলমে জোর হয়। সে জন্যেই ত সাহিত্যিকদের নিয়ে লোকে হাসি ঠাট্টা করে নির্ভয়ে নির্ভাবনায়। তা যাক সে কথা। বলি এই পটিয়সী বিদ্যেটা কোন্ গুরুর কাছে শিখেছিলেন তা একবার চুপি চুপি বলুন না আমায়। এই মরুভূমির দেশে আনন্দসিং না হয় একজনই ফুলে ফুলে মঞ্জরিত হয়েছিল। কিন্তু আমার বাংলা মুলুকে চারি দিকেই লোকে প্রেমে পড়বার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। একবার আপনার গুরুজীর ঠিকানাটা বাৎলে দিন। তারপর আর আমার পশার মারে কে? বালিগঞ্জ লেকের পারে ভাল ঝুলবারান্দাওলা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নোটিস লটকে দেব—

প্রেমসাগর কার্যালয়। পুস্কর তীর্থে প্রাপ্ত স্বপ্নাদ্য মন্ত্র॥

কিন্তু আনন্দ সিং আমায় একেবারে নিরাশ করলেন। তাঁর বিদ্যাটা শুধু রাজারাজড়াদের দরবারে শোনা কাহিনী থেকে শেখা। খোশামোদ আর বাড়িয়ে বলার দরবারী বিদ্যাটা তিনি প্রেমের কারবারে খাটিয়ে অঢেল মুনাফা মেরেছিলেন।

হেসে তিনি শুধু একটা কবিতা আওড়ালেন। এইটি ছিল তার মূলমন্ত্রঃ

অগর শাহ রোজবা গোযাদ শব্ অস্ত্ ইন্।
বিবায়দ গুফৎ বিনম্ মাহ্ ই° পরবিন্॥

অর্থাৎ

রাজা যদি বলে—দিন হয়ে গেছে রাত।
বলো—চন্দ্র তারা করে জোলুষে মাত॥

ভয়ানক নিরাশ হলাম। ওঃ, শুধু এইটুকু? এই বিদ্যা ত অফিসে ওই খাটাশমুখো রাসকেলটা পর্যন্ত তার 'বসে'র কাছে চালিযে চালিয়ে ভাল রিপোর্ট পেয়ে আসছে। ওতে কি আর কাজ হবে?

হয়, মাশাহ্ হয়। অফিসে 'বস' আর ঘবে বৌ, ও দুই-ই এক চীজ, মাশাহ্। একই আশমানের চিড়িয়া. শুধু একটু রঙ চড়ানোর ফারাক—এই যা।

সবিনয়ে স্বীকার করলাম। তবে বললাম যে আমরা সামান্য প্রাণীরাও আমাদের খুদে কর্তাদের মন ভেজাবার জন্য বাড়িয়ে বলে থাকি। পাশের বাড়িব বিনা ভাড়ার রোয়াকে বসে রাজা উজীর মারাতেও কম যাই না।

আনন্দসিং মানতে রাজী হলেন না। আপনারা লড়াই করেন না। আমাদের সঙ্গে পুরুষালীতে পাল্লা দেবেন কি করে? বলুন ত, রাস্তা দিয়ে একটি সুন্দর তরুণী চলে যাচ্ছে; তার কি বর্ণনা আপনারা ইয়ার-বর্কশিদেব মধ্যে বসে দেবেন?

ভাববার জন্য অপেক্ষা করলাম না এক মুহূর্ত। ছেলেবেলায় একটা পত্রিকায় কার্টুন দেখেছিলাম। পাড়ার একটি মেয়ে বাঁটুল ছাতা হাতে করে চলেছে। কবি গলির মোড়ে রোয়াকে বসে—

ময়ূরপঙখী তনু
ময়ূরের মত পেখম মেলেছে
দেখিয়া উতলা হনু।

'হন্' কথাটার উপর দুরকম মানে চাপিয়ে সেই পত্রিকায় একটা মারাত্মক রকম ঠাট্টার ছবি এঁকেছিল। ছবিটা মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। আজকের আলাপের মধ্যে বাড়িয়ে বলার বিদ্যায় বাঙ্গালীকে এই রাজপুত বীর যে চ্যালেঞ্জ দিলেন তার জবাবে চটপট এই বর্ণনাটাই ঝেড়ে দিলাম।

হ্যাঁ, ভারী ত বললেন, স্যার। আপনার কর্ম নয়। আপনারা একটু বেশী পশ্চিম-ঘেঁষা হয়ে গেছেন। বিলেতী লেখাপড়া অনেকদিন ধরে শিখেছেন কিনা। তবে এই শুনুন আমি কি বলতামঃ—

জ্বলে পুড়ে খাঁক পরাণ আমার,—
তুমি হলে কাশ্মীর;
যেথা গেলে পাখা পালক গজায়
কেটে ভাজা মুর্গীর।

অবাক করলেন আনন্দ সিং! যশোরে বসে এক কালে শাহজাদা খুরমের দরবারে যশোর আর কাশ্মীরের আবহাওয়া নিয়ে তুলনা হয়েছিল। সেখানে মৌলানা উর্ফি'র একটা ফারসী কবিতা ঝেড়ে একজন খয়ের খান কাশ্মীরের হয়ে বাজী মাৎ করেছিলেন। সেই কবিতার ছায়া নিয়ে আজ আনন্দ সিংও টেক্কা দিলেন।

ঠাকুর সাহেবের মনে ততক্ষণে রঙ লেগেছে। তিনি একটার পর একটা কবিতা আওড়ে যেতে লাগলেন। কবি কে তা জানা নেই। কিন্তু তার ভাব আর ভাষার ছটা প্রেমে পড়ার জন্য তৈরী তরুণীদের মন কতখানি ভোলাবে তা পাঠিকারা বিচার করে দেখুন।

চাঁদ কি গোলাই লেকর সাপ কা সা পৈচ ও খুম।
ঘাস কি পাত্তি কি হাল্‌কি থের থ্রাহাৎ বৈশ ও কম॥
বৈদ-ই মজনুন কি নজকৎ বৈল কে বাল কী কুজী
বাঁক পণ তুষ কা—নের্‌মি গুল-ই-কোহ্‌সর কী॥
আগ কা তন বুন গয়া ঔর নুর কী মুরত বনী।
শক্‌ল্‌ ঔরৎ কী বনী কিয়া—মোহনী সুরৎ বনী॥

চাঁদ থেকে নিয়েছ সুডৌল
সর্প হতে তনুর বঙ্কিমা

তৃণ হতে লাবণ্য বিকাশ
কম বেশী সুন্দরের সীমা।
আইভির কমনীয় শোভা
লতা সম বঙ্কিম বল্লরী
পাহাড়ীয়া গোলাপের বিভা
ময়ূরের বর্ণালী লহরী।
অনলে ভরানো দেহলতা
আনন্দের ছবি একখানি,
রমণীয় মুরতি তোমার
দরশনে হরষণ মানি।

হায় বিশ শতকের সাদামাঠা লেপাপোঁছা ইংরেজী কবিতা হায় রবিঠাকুরের পরের যুগের বাংলা কবিতা! তোমরা এ যুগে প্রেয়সীর চোখে সুরমা লাগান ত দূরের কথা, তার চোখে সান-গ্লাস এঁটে দিয়েছ। যাতে রামধনুর মায়া তার নজরে সহজে না আসে।

এই দুঃখটি নিবেদন করলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি এখনো ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নতুন প্রেমের কবিতা কি বের হচ্ছে তার খবর রাখেন।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললাম,—কিন্তু এমন অবস্থাও কি কখনো এসেছিল—যখন এ অস্ত্রে আর শাণায় নি?

হেসে ঠাকুর সাহেব জবাব দিলেন—হ্যাঁ, একবার খুব মান অভিমানের পালা হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু তখনো আমি হরেক রকম চেষ্টার মধ্যে এই বিদ্যাকেও হাতে রেখেছিলাম। বলেছিলামঃ—

হিমানী দিয়েছে শীতলতা
দেবদারু কঠিনতা ভরা
লৌহসম কঠিন হৃদয়
হয়ে গেল পাথরেতে গড়া।

বাঃ, বাঃ। এতও ছিল পেটে পেটে? এক কালে রাধা নামে সাধা বাঁশী কৃষ্ণের হাতে যেমন লীলাভরে বাজত ঠিক তেমন ভাবে এর পূর্বপুরুষদের হাতে

প্রেমসে তরোয়াল খেলত। সে লীলাখেলা এখন শ্রীমানের হাত থেকে জিভে এসে ঠেকেছে।

তা, প্রেমের দায় যে প্রাণের দায়ের চেয়েও বেশী।

শুধু তাই নয়। লাউ কুমড়োর ঘ্যাট-খেকো বাঙ্গালীর ধাতে বাড়াবাড়িটা যে বেশী দূর সম্ভব নয় তাও মানতে হবে। ওই ত' থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। ওর মধ্যে কোথায় পাব কাশ্মীরী কোফ্‌তার সোয়াদ আর মুর্গী-মুশল্লমের তার?

এই কর্মী ছাটাই, ইনকালাব আর গণবিক্ষোভের বাজারে কোন্ বাঙ্গালী বাদশার হারেমের নাম-লুকানো কবিদের মত লিখতে পারবেঃ—

গর সবাহ্ আরদ সমিমে পিরহন সু এ চমন।
গুন্‌চে রা দিল দর-উ-নে সিনে চুঁ শুল বস্-এ গুফ্‌ত্॥
প্রভাতের বায় যদি বয়ে আনে কাঁচুলি সুরভি তব॥
হিয়ার কোরক বিকশি' উঠিবে—কুঞ্জে কুসুম নব॥

একমনে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়ছিলাম। হঠাৎ রাস্তার একটা ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজে মুখ তুললাম। পাহাড় প্রমাণ এক টাঙ্গাওয়ালা তড়াক করে তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। একেবারে নিজের স্ত্রীর ভাইয়ের পত্নী ভ্রাতৃপ্রবর এই ঘোটক মহারাজকে হেঁকে গালাগালি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তিন মিনিটের মধ্যে তিন মাইল পথ আনা সাগরে যদি সাহেবান সোয়ারদের আমি না পেঁছে দিতে পারি তাহলে আমি যেন দিল্লীর মসনদে না বসতে পারি।

আর সামলাতে না পেরে বাপ ঠাকুর্দার নিজস্ব বাংলাতে বলে ফেললাম-- সাবাস, টাঙ্গাওয়ালা। দিল্লীর মসনদ তোমার জন্যেই হা পিত্যেশ করে বসে আছে।

দিল্লীর মসনদ কেন, যে মহাকালের হাতে মসনদ আর মহারথীরা সমান ভাবে খেলার পুতুল সে মহাকাল কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আজ এখানে বসে ঠাকুর সাহেবের আধুনিক প্রেমের খেলার কাহিনী শুনে মনে মনে হেসেছি। ছেলেবেলায় আরো একটি প্রেমের গল্প শুনে রাজোয়ারার কাহিনীর দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে হচ্ছে রাজোয়ারার প্রথম বীর, মেবারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা রাওয়ের প্রেমের খেলা। সহজ সরল মেঠো বাঁশীর সুরের মত।

উদয়পুর থেকে দশ মাইল দূরে একলিঙ্গ মহাদেবের পুজার গাঁয়ে শিশু বাপ্পাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার বাবা ছিলেন রাজা। কিন্তু শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মা লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন এখানে। শিশু রাজপুত্র গাঁয়ের ছেলে হয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু তাতে কি হবে? আগুন যদি সত্যি আগুন হয় তা কি কখনও ছাই চাপা থাকে? সকাল সাঁঝে গরু চরানর ফাঁকে ফাঁকে বাপ্পা রাখাল রাজা হয়ে বসল। রাখালরা তার সব কিছু ভাল দেখে। সব হুকুম তামিল করে।

ঝুলন পূর্ণিমার দিন এল। সব ছেলে মেয়েরাই ঝুলাতে ঝুলে খেলা করবে। কিন্তু দেবতার মন্দিরের কুঞ্জবনে। গাঁয়ের রাজার মেয়েও এসেছে। এসেছে সব সখীরা, সব মেয়েরা। কিন্তু রশি আনে নি কেউ। এখন কি করে?

বাপ্পা বেড়াতে এসেছে কুঞ্জবনে। মেযেবা সবাই ওকে ধরল—দাও রশি যোগাড় করে। না হলে যে ঝুলন হয় না।

বাপ্পা রাজী হল। সে রশি এনে দেবে। প্রাণ ভরে দুলে মজা করতে পার, কিন্তু তার আগে একটা খেলা খেলতে হবে আমার সঙ্গে।

রাজকন্যা শুধোল—কি সে খেলা?

রাখাল রাজা উত্তর দিল—এমন বেশী কিছু নয়। শুধু বিয়ে বিয়ে খেলা।

সবাই রাজী হয়ে গেল। বাপ্পার চাদর আর রাজকন্যার ওড়নাতে পড়ল গেরো। ওরা দুজনে আর এক দুই করে দু'শ জন মেয়ে হাত ধরাধরি করে গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচল। বিয়ে বলতে ওরা শুধু এইটুকুই বুঝত, ওইটুকুই জানত। আশ মিটিয়ে তারা গাছের চাবদিকে ঘুরঘুব করে হাত ধরে নাচল। তারপর শুরু হল ঝুলন। সাঁঝে সবাই ফিরে গেল বাড়ি। সবাই গেল ভুলে।

বাপ্পার সাথী রাখাল বালকরা কথা দিল যে তারা কেউ একথা ফাঁস করে দেবে না।

এদিকে বাপ্পা যে গাইদের চরাতে নিয়ে যায় তার মধ্যে সেরা মুংলি গাইটা সন্ধ্যাবেলা এক ফোঁটাও দুধ দেয় না। গাঁও বুড়ারা বলেন বাপ্পা চুরি করে দুধ খায়। কিন্তু বাপ্পা কি কখনও চুরি করতে পারে? সে নিজেই গাইটার উপর কড়া নজর রাখল। দেখল যে ঝোপঝাড় পেরিয়ে গাই কখন চুপিসারে চলে আসে একটি শিবলিঙ্গের কাছে। তার বাঁট থেকে মহাদেবের মাথায় ঝরতে থাকে দুধ—আপনা থেকে।

কাছেই এক মহাপুরুষ ছিলেন ধ্যানমগ্ন।। বাপ্পা তাঁর ধ্যান ভাঙ্গাল। খবর পেল এক দিব্য জীবনের। সাধুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিল। তিনি ত' জানতেন যে এ ছেলে রাখাল নয়, রাজপুত্র। ভারতের সবচেয়ে বড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হবে একে দিয়ে।

দীক্ষা নেবার পর বাপ্পা স্বপ্নে পেলেন ভগবতী ভবানীর আবির্ভাব।

বাঘে চড়ে লাল বস্ত্র পরে এলেন মা ভবানী। বর্শা, তীর আর ধনুক দিলেন বাপ্পাকে। আর দিলেন বিশ্বকর্মার তৈরী দুদিকে ধার দেওয়া তলোয়ার। শুধু তলোয়ারের ওজনই ছিল আধ জন মানুষের সমান।

মহাপুরুষের পৃথিবীর কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপর দিন ভোরে তিনি দেহরক্ষা করবেন। তার আগেই বাপ্পাকে শিবলিঙ্গের কাছে আসতে বললেন।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে বাপ্পা ঠিক সেই ভোরেই ঘুম থেকে উঠলেন দেরিতে। মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আর মিলল না। তার বদলে শূন্যে দেখলেন অপ্সরারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রের রথ। তাতে বসে আছেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন, বৎস, উপরের দিকে তাকাও—যত পার উপরের দিকে। উঁচুতে তাকাতে তাকাতে বাপ্পা অন্য মানুষদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বড় হয়ে গেলেন।

অবাক হয়ে বাপ্পা ঘরে গিয়ে মাকে সব কথা জানালেন। জানলেন তাঁর কাছে যে বাপ্পা রাখালের ছেলে নয়, রাজার ছেলে। তাঁর মা হচ্ছেন রাজার ঝিয়ারী। শুনে বাপ্পা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আর গরু চরাবেন না. মানুষের মত ভাগ্যের সন্ধান করবেন।

এদিকে রাজকন্যার বিয়ের সময় এল। কিন্তু কোষ্ঠী বিচার করে পুরোহিত বললেন, মহাসর্বনাশ, এ মেয়ের যে এর মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেছে।

ধমক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা স্বীকার করলেন যে খেলার ছলে গাছের তলায় তার পুতুল খেলার বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু তারি সঙ্গে নয়, গাঁয়ের দুশো মেয়ের সঙ্গে। হাতে হাত ধরা গাটছড়া বাঁধা, গাছের চার দিকে সপ্তপদী—আর বিয়ের বাকী রইল কি?

বাপ্পা পালালেন তাঁর শৈশবের আশ্রয় ছেড়ে। দুশো বিয়ে করা বৌয়ের বাপের গ্রাম ছেড়ে। চিতোরে এসে মামার রাজ্যে মাথা গুজলেন। ক্রমে সেখানেই রাজা হয়ে বসলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেবেলায় খেলার ছলে বিয়ে করা বৌদের ভোলেননি।

কিন্তু রাজস্থানের প্রেমের কাহিনী তার পুরুষের প্রেম নিয়ে নয়। নারীই

সেখানে মহীয়সী। রাজোয়ারায় নারীই হচ্ছে রাজসী।

শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ ঘোরীর সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে সব সামন্তদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কি কৌশলে যুদ্ধ করবেন তা বিচার করবার জন্য অন্দর-মহলে সংযুক্তার কাছে গেলেন। সংযুক্তা তাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সারা পৃথিবীতে যেখানেই নারী তার নিজের স্বাধীনতা, নিজের অধিকার পায়নি সেখানকার নারীর মনের কথা। তিনি বলেছিলেন, "মেয়েদের কাছে কে বা পরামর্শ চায়? পৃথিবী মনে করে যে, তাদের বুদ্ধি নেই। তারা যখন সত্য বাণী বলে তখনো কেউ তাতে কান পাতে না।......বিজ্ঞ জ্যোতিষীরা এই গ্রহ-নক্ষত্রেরও গতিবিধি গুণতে পারে বই দেখে। কিন্তু নারী—পুঁথির তারা কিছুই জানে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমরা তোমাদের সঙ্গে সমানভাবে সয়ে যাই। আমরা হচ্ছি সরোবর আর তোমরা হচ্ছ হাঁস। আমরা না থাকলে তোমরা আর কি?"

এই হাঁসের কথায় মনে পড়ল আর এক রাজসী রাজকন্যার কথা। বাদশা আওরঙ্গজেবের প্রতাপ যখন সব চেয়ে বেশী তখন তিনি চেয়ে পাঠালেন রূপ-নগরের রূপসী রাজকন্যাকে। মাড়োয়াবেব ছোট্ট এক রাজত্ব হচ্ছে রূপনগর: সাধ্য কি তার যে দিল্লীশ্বরের হুকুম অমান্য কববে? তার উপর তলবের সঙ্গে এল দু হাজার ঘোড়সোয়ার। বাদশার বেগম যিনি হবেন তাঁব উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে বৈকি।

কিন্তু রূপনগরী এই বিয়েকে কেমন সম্মান বলে মনে করলেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ পড়ে সব বাঙ্গালী জানে। রাজস্থানে তখন মেবারের রাণা রাজসিংহের বীরত্বের জয়গান চলছে ঘরে ঘরে। তিনি কি আসবেন না এই অসহায়া রাজকন্যাকে রক্ষা করতে? একথা সত্যি যে, অম্বরের মত বড় রাজাও দিল্লীর হারেমে মেয়ে পাঠিযে আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু যদি কোন রাজপুত নারী তাঁর বংশের সম্মান, হিন্দু নারীর ধর্মরক্ষা করার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করে রাজপুত বীর কি আশ্রয় দেবে না? "রাজহংসী কি বকের সঙ্গিনী হবে? বিশুদ্ধ বংশের রাজপুতানী কি বাঁদরমুখো বর্বরের বৌ হবে?"

বসুন্ধরার মত রূপসীও যে বীরভোগ্যা সে কথাও রূপনগরী তাঁর গোপন আমন্ত্রণে জানিয়ে দিলেন। রাণা রাজসিংহের বীরত্বে কীর্তিতে রাজকন্যা মুগ্ধ হয়ে আগে থেকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করে রেখেছিলেন। বহুদিনের পরিচয়ে

নয়, প্রথম দর্শনে নয়, শুধু বীরত্বের কথা শ্রবণেই যে প্রেম সে প্রেম রাজপুতানীর পক্ষেই সহজ, স্বাভাবিক।

বীরপূজায় তার সৃষ্টি, বীরত্ব দিয়ে তা সাঙ্গ।

শেখ সাদীর একটা কবিতা আছে—

চঃন জান-ই-হিন্দি কাশে দার আশিকি মর্দানা নিশ্‌ত্‌।
শকতাউ বার শাম-ই কুষ্‌তা কার-ই-হার পরোয়ানা নিশ্‌ত্‌।

ভালবাসাতে হিন্দু মেয়েদের মত এত সাহসী আর কেউ নেই। সব পতঙ্গই ত' আর নিভে যাওয়া মোমবাতির আগুনে পুড়ে মরতে পারে না।

কিন্তু সে মোমবাতি যখন আঁধার ঘরে কামনাব শিখা জ্বালিযে জেগে আছে তখনো রাজপুত নারীর সাহসের অভাব থাকে না। অম্বরের আঁধার প্রায় শিষমহলে মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঁচের মধ্যে তার হাজার হাজার ছায়া দেখতে দেখতে এমনি একটা কাহিনী মনে পড়েছিল।

জয়সিংহ হারা (হর) বংশের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। জয়পুরী কাছোয়ারা মোগলের সভ্যতার রস পেয়েছে। দিল্লীর মারফত পেয়েছে সারা দুনিয়ার হাল ফ্যাসনের সুন্দরীদের হাব-ভাব, পোশাক-আশাক। আশাক কথাটার মানে কি মশায়? জানি না। তবে ধরে নিলাম যে, ওটা হচ্ছে প্রেমের ধরন। প্রেমের ধরন বস্তুটা যে কি তা সেকালের হারেমের রূপসীরা খুব ভাল করেই জানতেন।

কিন্তু রাজপুত অন্দর-মহলের মহিলারাই বা কম যাবেন কেন? হিন্দু-শাস্ত্রেও ত' প্রিয় প্রসাধন বলে একটা বিদ্যা আছে। তার উপর আছে দিল্লীর আমদানি নতুন ধরন-ধারণ। জয়পুরের সুন্দরীরা তাঁদের লেহ্‌ঙ্গার ঝুল ছেটে ফেলতে লাগলেন। ক্যা বেশরম কী বাত!

রঙীন ঘাগরার নিচের সুঠাম চরণের কিঙ্কিনী আব্রু থেকে ছাড়া পেয়ে অম্বরের মার্বেলের মেঝেতে ঝুম ঝুম বাজতে লাগল। বিনা বাধায়,—পুরুষের মনে ঝঙ্কার তুলে।

জয়সিংহ তাঁর নতুন রাণীর ঘাঘরার লম্বা ঝুল নিয়ে ঠাট্টা শুরু করলেন। জয়পুরের সুন্দরীরা তাঁদের রূপ দেখাতে জানে, মন ভোলাতে জানে। কোটার সুন্দরী কি পিছনে পড়ে থাকবেন?

এই না বলে তিনি কাঁচি তুললেন ঘাঘরা ছাঁটবার জন্য। সংগে সংগে রাণী তুললেন—কি? অভিমান নয়, নয়নবাণ নয়, এমন কি গোসাঘর পর্যন্ত নয়। সোজাসুজি তাঁর স্বামীরই তলোয়ার। শাসিয়ে দিলেন যে, আবার যদি কোনদিন পতিদেবতা তাঁর মান-ইজ্জত নিয়ে বেয়াদবি করেন তাহলে তিনি হাড়ে হাড়ে তাঁকে সমঝিয়ে দেবেন যে, অম্বরের পুরুষের ছুরি চালানর চেয়ে কোটার মেয়ের তলোয়ার চালানর বাহাদুরী অনেক অনেক বেশী।

গণোরের রাণী তাঁর স্বামীর কাছে পরলোকে চলে গেলেন এমনিভাবে বীর মহিমায়। একের পর এক করে পাঁচটি দুর্গ তিনি হারালেন। পাঠান সৈন্যদের কিছুতেই রুখতে পারলেন না। তাঁর স্বামী এর মধ্যেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। নর্মদা তীরে শেষ ঘাঁটিতেও যখন তাঁর হার হল পাঠান সেনাপতি প্রস্তাব পাঠালেন যে, যুদ্ধ ত' শেষ হয়ে গেছে, এখন রাণী তাঁর দেশ আর খানের হৃদয়ে রাজত্ব করলেই সব দিক রক্ষা হয়। হাতে হাতে উত্তর পাবার জন্য খান নিজে রাজবাড়ির নিচের তলায় অপেক্ষা করছিলেন। কাজেই রাজী নই এই জবাবে কোন লাভ নেই।

রাণী রাজী হলেন। শুধু তাই নয়; খানের যুদ্ধে আর নারীর প্রতি দুয়েতেই বীরত্ব দেখানর প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন। আরো লিখলেন যে, এহেন শিভ্যাল্‌রীতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। খানকে তিনি বরণ করলেন স্বামীরূপে। নিজে হাতে তাকে বিয়ের পোশাক সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। বরবেশে আসুন খান; বরনারী তাকে ছাদের উপর উপযুক্তভাবে জাঁকজমকের মধ্যে বরণ করবেন। রাণীর সংগে বিয়েতে রাজার যোগ্যভাবেই আয়োজন করতে হবে।

মাত্র দুটি ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। বিয়ের আয়োজন এর মধ্যেই সেরে নিতে হবে। হাতে সময় যত কম জাঁকজমক ঠিক ততই বেশী। নহবতের বাজনার সুরে দু দলই যুদ্ধের বাজনার কথা ভুলে গেল। বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাণী প্রেমে পড়েছেন। তাঁর নিজে হাতে পাঠানো পোশাক, গণোরের রাজবংশের সব দামী জহরৎ পরে ছাতে উঠে এলেন খান। হঠাৎ পাওয়া প্রেমে, বীরত্বের প্রশংসায় এমনিতেই দিশেহারা ছিলেন তিনি। রাণীর রূপ দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সুরসিকা, কথায় পটু নাগরীর মোহিনী প্রভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কোথা দিয়ে ঘণ্টাগুলো যেন নিমেষের মত কেটে যেতে লাগল।

এদিকে খানের গা গরম হয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন যে, প্রেমের তাপ এরকমই হয়। যুদ্ধে জয় করে রাজ্য লাভ করার চেয়ে বীরত্বে মন ভুলিয়ে সে

রাজ্যের রাণীকে লাভ করা—সে যে অনেক বেশী বাহাদুরী। পৃথিবীতে আর কোন্ বীর এহেন প্রেম পাবার মত কপাল করেছিল? খান দেহে মনে গরম হয়ে উঠলেন।

মাতাল করা শরবতে আর দরকার নেই। মন গেছে উতল হয়ে; শরীরে জ্বলে উঠেছে আগুন। এখন ঠাণ্ডা খাবার জলই যথেষ্ট।

কুজো থেকে দেওয়া হল ঠাণ্ডা জল; ঝালর দেওয়া পাখা দিয়ে সখীরা বাতাস করতে লাগল জোরে। বাসরশয্যা যে তৈরী।

খান তাড়াতাড়ি তাঁর বরবেশ খুলে ফেলতে লাগলেন। একি বাসরে দোসরের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হওয়া? মিলন রাতির পরম লগ্ন কি এলো এখন?

হ্যাঁ এলো বৈ কি। একই পথে গেলেন দুজনে। একই সময়ে।

গরম আর সইতে না পেরে খান বরবেশ জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন! কিন্তু ততক্ষণে সে পোশাকের কাজ খুব ভালভাবেই এগিয়ে গেছে। রাণীও তাঁর বধূবেশ খসিয়ে ফেললেন। গম্ভীরভাবে বললেন,—তোমায় এখন জানিয়ে দিচ্ছি, খান, যে তোমার সময় হয়ে এল। আমাদের মিলন আর আমাদের বিচ্ছেদ একই সময়ে শুরু হবে। এই পোশাকে বিষ মাখান আছে। বিষের জ্বালায় তুমি এখনি মরবে। আর এই আমিও চললাম আমার স্বামীর কাছে।

কেউ কথা কইবার আগে, বাধা দেবার আগে রাণী দুর্গের চূড়া থেকে নিচে নর্মদার জলে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলেন। খানও বিষের জ্বালায় মারা গেলেন। তাঁর কবর ভূপাল যাবার পথে এখনো দেখা যায়।

লোকে বলে এই কবরে সির্নি দিলে এখনো নাকি জ্বরের জ্বালা সেরে যায়।

দূরে শ্যামল বাংলা দেশে বসে পাঠিকারা হয়ত এই পর্যন্ত পড়ে এই লেখাটা পাশে সরিয়ে রাখবেন। মুচ্‌কি হেসে বলবেন—যত সব গাঁজা গল্প। বন্ধুরা এখনি বলছেন—যত রাজা রাজড়ার আজগুবী গল্প নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে শুরু করেছি। যে সময়কার সঠিক ইতিহাস বানানো গল্পের মধ্যে মিশিয়ে হারিয়ে গেছে সে সময় নিয়ে নাড়াচাড়ার কোন মানে হয় না। যে রাজা রাজড়ারা অতীতের বস্তু তাঁদের নিয়ে আর টানাটানি কেন? একশ বছরের উপর ধরে বাংলা সাহিত্য রাজস্থানের গান গেয়েছে। এখনো, এই গণতন্ত্রের যুগে আর কেন?

আমিও বলি তাই। আমারো এক মত। তবু একটা জবাব দিই। পাড়ার পাইকিরী রোয়াকে বসে রাজা উজীর মারা ত' আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাধনা।

আমিও ত' সেই রাজা উজীরই মারছি। তফাতের মধ্যে রোয়াকে বসার বদলে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ান, পাষাণে কাণ পেতে তার অতীতের গুমরে ওঠা কান্না শোনা। চিরকালের রাজোয়ারার রাজসী কাহিনী। আজকের দিনের পটভূমিকায় নতুন করে বলা। এক হাজার বছর পরে দেশ আবার স্বাধীন হল। নতুন পথে নতুন জগতে তার যাত্রা। আজ আমাদের কতো দরকার প্রতাপ আর শক্তের মধ্যে লড়াই না করে ভাই ভাই এক ঠাঁই দাঁড়ান। কতো দরকার সোয়াই জয়সিংহের মত বাইরের পৃথিবীর সব নতুন বিদ্যাকে নিজেদের দেশে টেনে আনা, পদ্মিনীর মত দেশের বিপদে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি দেওয়া। একদিন দেশ ছিল শুধু রাজার মাথাব্যথা। আজ সেটা আমাদের সকলের সমান দায়িত্ব। ত্যাগে আর সাধনায় সবাকার ধন। যে গুণ, যে বীরত্ব আমরা দেখেছি শুধু রাজারাণীদের মধ্যে তাকে পেতে হবে আমাদের সকলের মধ্যে। জনসাধারণই এই যুগে রাজারাণী।

দিল্লী কলকাতায় রাস্তাঘাট মানুষের চেহারা দিনের পর দিন বদলিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন ঘরবাড়ি কলকারখানা মাথা তুলে স্বাধীনতার আকাশের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। নিযন আলোতে অমাবস্যার রাত আলোময়। আমি এখানে যশলমীরের সীমাহারা মরুর মধ্যে পথ খুজে চলেছি। এখনি আঁধার নামবে—রাশি রাশি বালিযাড়িব মধ্যে বাসর জাগতে।

পঁচাত্তর মাইল দূরে ভাবতেব শেষ বেল-স্টেশন।

পিছনে পশ্চিমের দিকে হলদে পাথরের বিবাট যশলমীর দুর্গ যেন আকাশের গায়ে আঁকা ছবি। তার চূড়ায় রাজবাড়িব সিঁথিতে সিঁদুব মাখিয়ে সূর্য অস্ত গেল।

শেষ রাতে প্রথম আলোর রেখা জাগতে দেখেছিলাম এভারেস্টে। মানুষের ভাঙাগড়া খেলা তুচ্ছ কবে হিমালয অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্যে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ আব ফগের মাযা তাকে ঢেকে রাখতে পারবে না।

দিনশেষের প্রথম আঁধাবেব মধ্যে অনুভব কবলাম মবুভূমিকে। মানুষের লোভ, হিংসা হানাহানির কত ঘটনা হয়ে গেছে এই বালির বুকে। তবু তার শান্তি আর আভবণহীন বুপকে নষ্ট করতে পারেনি কেউ। মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা থেকে মধ্যযুগের আধো অসভ্যতা পর্যন্ত। উটের পিঠে পশরা নিয়ে ক্যারাভান চলেছে; ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বীরবেশে বর। ছুটে চলেছে হিংসায়

উন্মত্ত সেনাদল। সে সব যাত্রার কথা মরুভূমি নিমেষে ভুলে আবার ধ্যানে ডুবে গেছে।

মানুষ কিন্তু ভোলেনি এই মরুদেশের বীরগাথাকে। তার বীর আর বীরাঙ্গনাদের। তাই ত' বার বার ছুটে আসি এখানে। ভাঙ্গা দেউলে আর দুর্গের দেওয়ালে, মরুর ঝাউয়ের ঝোপে কান পেতে শুনি তাদের বাণী। দুহাতে অঞ্জলি পেতে তুলে নিতে চাই তাদের প্রাণরসের ধারা। সে রসে নতুন জীবন পাবে আমার স্বাধীন দেশের নতুন নরনারী। সাধারণ জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের কাহিনীও হবে মহিমাময়ী -- রাজসী।

॥ সমাপ্ত ॥